মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR

الأبرار
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৪, সংখ্যা-১১
ডিসেম্বর ২০১৫ ইং, রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হি., অগ্রহায়ণ ১৪২২ বাং
ربيع الأول ١٤٣٧هـ دسمبر ٢٠١٥م

প্রতিষ্ঠাতা
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
০১১৯১৯১১২২৪

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :.............................. ৫
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১২..... ৬
দরসে ফিকহ :
পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৩......... ৮
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৩
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
হারাম উপার্জনের ভয়াবহতা............................ ১৪
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
লা-মাযহাবী ফিতনা ও কিছু কথা....................... ১৬
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
বিরল প্রতিভার চিরবিদায়............................... ১৯
মুফতি আব্দুল হালিম বোখারী
দেশ ও জাতির সেবায়
ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর অবিস্মরণীয় অবদান..... ২১
মুফতী মুহাম্মদ কিফায়তুল্লাহ শফিক
অমুসলিম দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের পাথেয়
হিজরতে হাবশা ২৯
মুফতি শরীফুল আজম
বিদায় ফকীহুল মিল্লাত : ভালো থাকবেন পরকালেও..৩৬
মুফতি এনায়েতুল্লাহ
নবী প্রেমের স্বরূপ....................................... ৩৮
হাফেজ মুফতী রিদওয়ানুল কাদির
ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম... ৪৪
মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৭

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক: ০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

আমরা শোকাহত...

সে দিনও রবি তার স্বীয় মহিমায় ছিল উদ্ভাসিত। তাপের ভরা যৌবনে উত্তপ্ত। আলোক রশ্মিতে দুনিয়ার প্রতিটি অণু-পরমাণু ছিল উচ্ছ্বসিত। তার স্নিগ্ধতায় যার যার মতো করে উপকৃত হলো আল্লাহর অগণিত মাখলুক। সময়ের এক সন্ধিক্ষণে কক্ষপথ অতিক্রম করে তার প্রস্থান হবে। বিকীর্ণ কিরণ আর উত্তাপের অকল্পনীয় নজরানা বিলায়ে সেও তখন অন্য প্রান্তের যাত্রী। রাতের আঁধারগুলো যেন চৌহদ্দি পেরিয়ে ধেয়ে আসছে। সূর্য এখন লালাভ এক প্রকাণ্ড ডিম্ব-কুসুমপ্রতিম। ক্ষণিক পরেই তার গোজরান হবে অদৃশ্য গন্তব্যে।

কেইবা জানত দিনের সূর্যের পাশাপাশি আজ দ্বীনের এক মহা অর্কেরও প্রস্থানের পালা। ঠিক এই মুহূর্তেই মানব ইতিহাসের অন্যতম মহাসাধক আল্লাহর মেহমান হতে চলেছেন! কেইবা জানত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুরব্বি, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরাসহ অগণিত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক, প্রখ্যাত হাদীস তাফসীর ও ফিকহ বিশারদ, সুন্নাতে রাসূলের বিমূর্ত প্রতীক, উস্তাদুল আসাতিজা, শায়খুল মনকুলাত ওয়াল মাকুলাত, আসলাফে দেওবন্দের অন্যতম জানশীন, মুহিউস সুন্নাহ হযরত আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, শায়খুল হাদীস ফিল আরব ওয়াল আজম ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) গমন করবেন মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে।

হঠাৎ ভেসে এল হাজারো মানুষের আর্তচিৎকার। গগণবিদারী কান্নার রব। অশ্রু-বন্যা ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে এলেন মারকাযের ছাত্ররা। কাঁদতে কাঁদতে আগমন করলেন প্রতিবেশীরাও। কান্নার রব শুরু হলো আরো দূরে-আরো দূরে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। কান্নার চিৎকার আসতে লাগল নবীজির প্রিয় দেশ মদীনা শরীফ থেকে, মক্কা শরীফ থেকে, মুহূর্তেই সারা দুনিয়া থেকে।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান আর নেই। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

সকলে যেন আত্মহারা, সর্বহারা। এতীমত্বের গ্লানিমাখা অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে ধেয়ে আসছেন হাজারো মানুষ; হযরত ফকীহুল মিল্লাতের কফিনের পাশে। সামান্য দেরি হবে! না, এখনই আমরা আমাদের উস্তাদকে একনজর দেখব। আমাদের পীর, অভিভাবককে এক পলক দেখে মনকে সামান্য হলেও শান্ত্বনা দেব।

এমনি এক চিত্তবিনাশী মুহূর্তে হযরতের সাহেবজাদা এবং মারকাযের আসাতাযাগণ সম্বিতকে কাবোতে এনে চোখ মুছতে মুছতে পরামর্শে বসলেন হযরতের কাফন-দাফন ও জানাযাসহ সামগ্রিক বিষয়ে। তৎক্ষণাৎ পরামর্শ হলো, জানাযা হবে আগামীকাল ১১/১১/২০১৫ ইং বুধবার সকাল ১০টায়।

হযরতের অসিয়তের মধ্যে ছিল, তাঁর ইন্তিকাল যেখানে হবে, সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া, অন্য শহরে স্থানান্তরিত না করা। সুন্নাত মতে দাফন-কাফন এবং জানাযার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ কাফন-দাফন এবং জানাযার প্রস্তুতি নিতে যতটুকু সময় প্রয়োজন, এর চেয়ে দেরি না করা। উল্লেখ্য, যেখানে হযরত (রহ.) এর দাফনের স্থান নির্ধারণ করা ছিল সেখানে রাতের বেলায় কবর খনন সম্ভব না হওয়ায় রাতে দাফন সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। তাই এই অসিয়ত মতে তাঁর সাহেবজাদাগণ মারকাযের অন্যান্য মুফতিয়ানে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে জানাযার উপরোক্ত সময় ঠিক করেন।

পরের দিন লক্ষ লক্ষ মুসলমানের উপস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় হযরতের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এই জানাযা ছিল লাখো মানুষের মহাসমাবেশ। ঢাকা উত্তরের প্রতিটি মোহনায় ঘটে যায় মহাগণবিস্ফোরণ। স্মরণাতীতকালের এই ঢলেও মাশাআল্লাহ সকলে হযরতের আদর্শে আদর্শবান হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে জানাযা এবং দাফনের কাজ সুসম্পন্ন করেন।

হযরতের অগণিত ছাত্র, ভক্ত ও মুরীদদের মনে খুব ভয় ছিল জানাযায় অংশ নিতে পারবেন কি না। আল্লাহর কারিশমা, এমন সময় তিনি আল্লাহর মেহমান হন, যাতে তাঁর আন্তরিক ও অকপট ছাত্র, ভক্ত-মুরীদগণ জানাযায় উপস্থিতির বাসনা পূরণ হয়। ইন্তিকালের খবর পাওয়ামাত্রই যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন বসুন্ধরামুখী ভ্রমণ আরম্ভ করেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই

বসুন্ধরা-বারিধারা, কুড়িল, খিলক্ষেত এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। জানাযায় আগত লোকের চাপ এত প্রকট ছিল যে, বিভিন্ন এলাকায় যানজট আবার বসুন্ধরামুখী প্রবেশদ্বারসমূহে মানুষের ভিড়ের কারণে জানাযায় শরীক হতে পারেননি অগণিত মুসলমান। আল্লাহ! সকলের চেষ্টা ও মেহনত কবুল করুন। আমীন।

হযরতকে কবর দেওয়া হয় বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের 'এন'-ব্লকে পূর্বনির্ধারিত কবরস্থানে। হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) জীবিত থাকতে কয়েক বছর আগে ওই এলাকাটি একটি মসজিদ ও কবরস্থানের জন্য নির্ধারণ করা হয়। তাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ করছেন বসুন্ধরা গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেব, যা এ দেশের সবচেয়ে বড় মসজিদ হবে বলেও খবরে প্রকাশ। মসজিদের যাবতীয় প্ল্যান ও নকশা হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর পরামর্শক্রমেই করা হয়েছে। তাঁর আগ্রহ ও পরামর্শে বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেব ওই স্থানে ওই কবরস্থানের ব্যবস্থা করেন। মসজিদ এবং কবরস্থানের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয় হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর মাধ্যমে। আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন।

হযরতের ভক্ত-অনুরক্তদের আবেগী অনুযোগ মারকায থেকে এত দূরে কেন হযরতকে দাফন করা হলো? বাস্তবতা হলো বসুন্ধরা মারকাযের সম্পূর্ণ জায়গা মসজিদ মাদরাসার জন্য ওয়াকফ ছিল। ওয়াকফকৃত জায়গাকে কবরস্থান বানানো শরীয়ত মতে কোনোভাবে বৈধবলে মনে করতেন না হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)। এ কারণেই হযরত (রহ.) নিজ হায়াতে এই কবরস্থানে নিজ কবরের স্থান নির্ধারণ করে দেন।

হযরতের জানাযা ও দাফনে দেশের প্রায় বরেণ্য আলেমেদ্বীন, তালেবে ইলম, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

আমরা মারকায এবং হযরতের পরিবারের পক্ষ থেকে সকলের শোকরিয়া আদায় করি। এবং দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদের জাযায়ে খায়র দান করেন। সুন্নাতে নববীর যে আদর্শ বাস্তবায়নে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) পুরো জীবন আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন, যে স্বচ্ছ ও অমোঘ চিন্তাধারা বাস্তবায়নে হাজারো বাধা-বিপত্তি, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, তিরস্কার-ভর্ৎসনা, ঝড়-ঝাঞ্ঝা নীরবে সয়ে সয়ে-হাসিমুখে বরণ করে সুন্নাতে রাসূলের বিমূর্ত প্রতীক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন সে আদর্শ ও চিন্তাধারা বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাতেই মানব জীবনের সফলতা। মুসলিম উম্মাহের কামিয়াবী।

হুজুরের একটি স্পষ্ট আদর্শ ছিল, জানাযায় লাশকে সামনে নিয়ে বক্তৃতা-ভাষণ দেওয়া থেকে বিরত থাকা। সে কারণে হুজুরের জানাযায় বক্তৃতা-ভাষণের কোনো পরিকল্পনা ও কর্মসূচি ছিল না। সে জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাও করা হয়নি।

জানাযায় দেশের বরেণ্য উলামায়ে কেরাম এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। হুজুরের মুহাব্বত আর ভক্তি নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ উদ্যোগে অনেকে যাঁর যাঁর মতো করে নিজেদের কিছু কিছু অভিব্যক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।

এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে ব্যতিক্রমও ঘটেছে। যা সবার পছন্দ হয়নি এবং পছন্দ হওয়ার কথাও নয়।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) শয্যাশায়ী হওয়ার কয়েক বছর পূর্বে বিভিন্নজন পীড়াপীড়ি করছিলেন হযরতের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের জন্য। হুজুর কখনো এ বিষয়ে তাঁদের পীড়াপীড়িতে সায় দিতেন না। একসময় অনেক মুহিব্বীন একসাথে হুজুরকে করজোড়ে এ ব্যাপারে অনুরোধ করেন। একদিন হুজুর মুহিব্বীনদের নিয়ে বৈঠক করে বললেন, ইচ্ছা হলো আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন মুফতী জামাল সাহেব। আল্লাহর বড় হিকমত ছিল ওই দিন সকল মুহিব্বীন এক বাক্যে হযরতকে নিজ সুযোগ্য সন্তান মুফতী আরশাদ সাহেবকে স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের জন্য অনুরোধ করে প্রস্তাব পেশ করলেন। অনেক আলোচনার পর হুজুর তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে প্রস্তাবটি পাস করলেন। শাবান ১৪৩৫ হিজরীতে হযরত মুফতী জামাল সাহেব ইন্তেকাল করলেন। তখন হুজুরও বুঝে গেলেন ওই দিনের বৈঠকে মুফতী জামাল সাহেবের প্রস্তাবটি পাস না হওয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বড় হিকমত লুক্কায়িত ছিল। পরে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তাঁর সুযোগ্য সন্তান হযরত মাওলানা মুফতী আরশাদ সাহেবের বিষয়টি চূড়ান্ত করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁকে বিভিন্ন দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে থাকেন।

দীর্ঘদিন অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গত এপ্রিল ২০১৫ তে হুজুরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর নেওয়া হয়। যাত্রার আগের দিন মারকাযে হযরতের মুহিব্বীন, ভক্ত ও বিভিন্ন

মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকের ভিড়। মুহিব্বীন ও ভক্তবৃন্দরা এসেছেন হুজুরের এহেন অসুস্থাবস্থায় হুজুরের কিছু খিদমত করবেন, দু'আ নেবেন এবং হুজুরের চিকিৎসার জন্য মন খুলে হাদিয়া ইত্যাদি দেবেন।

বাদ মাগরিব মসজিদে উপস্থিত সকলকে নিয়ে হুজুর দু'আতে বসলেন। সকলকে অভয় দিয়ে কিছু নসীহতমূলক কথাও বলেন। প্রথমেই যা বললেন, তা হলো আমি দেখছি আমার মুহিব্বীনগণ টাকার বান্ডিল নিয়ে এসেছেন আমাকে দেওয়ার জন্য। আলহামদু লিল্লাহ আমার চিকিৎসা চলছে। অসুস্থাবস্থার হাদিয়াও চিকিৎসা খরচের জন্য হয়। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাকে হাদিয়াস্বরূপও কোনো কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। বরং আপনাদের ইচ্ছামতো অন্য খাতে সদকা করেন।

হযরতের কাজের কতই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা। অসুস্থ হওয়ার পর হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) নিজ পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনার ভার তাঁর বড় সাহেবজাদা মুফতী আরশাদ সাহেবকে প্রদান করেন। চিকিৎসার যাবতীয় আয়োজনে রাখেন নিজ ছোট সাহেবজাদা মারকাযুল ইকতিসাদিল ইসলামীর নির্বাহী পরিচালক মাওলানা মুফতী শাহেদ রহমানীকে। পাশাপাশি ইন্তিকালের ৬ মাস পূর্বে তাঁর ব্যক্তিগত হিসাবাদি রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিগত হিসাবগুলোর অডিটসহ ক্লোজ করার জন্য তাঁর ছোট সাহেবজাদার সাথে মারকাযের হিসাব বিভাগীয় কর্মকর্তা মাস্টার হাশেমকে নিয়োজিত করেন তিনি। এভাবে তিনি আপন দায়িত্ব গুটিয়ে নেন। ক্রমান্বয়ে সুস্থমস্তিষ্ক ও সুশৃঙ্খলভাবে নিজেকে পৃথক করে নেন সব কাজ থেকে। প্রস্তুতি নেন মাওলার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন বিশালায়তন এক কর্মযজ্ঞের নাম। তাঁর ব্যাপক খেদমাত সারা দেশেই সুবিস্তৃত ছিল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদরাসা-মসজিদ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা। স্বাভাবিকভাবেই এই বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে হিসাব-নিকাশ ও লেনদেনের পরিধিও ছিল বিশালায়তন। আল্লাহর কারিশমা, ইন্তিকালের পূর্বে এই বিশাল হিসাব নিকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পরবর্তী দায়িত্বশীলদের প্রতি ন্যস্ত করে দেন তিনি। মনে হয়েছে সামান্য হিসাবনিকাশ বাকী থাকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেননি।

তাঁর উভয় সাহেবজাদা আপন আপন দায়িত্বগুলো আদর্শিক পন্থায় পালন করেন। হুজুরের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা বিষয়ে মুফতী শাহেদ রহমানী সাহেব যে নজির স্থাপন করেছেন, তা বলতে গেলে অভূতপূর্ব। দিন-রাত তাঁর যেন একটিই ফিকির ছিল–হুজুরের কখন কী প্রয়োজন, হুজুর কোনো প্রকার সামান্যতম কষ্ট অনুভব করছেন কি না? মাতা-পিতার সেবাদানের আদর্শ হিসেবে তাঁর এই দীর্ঘ মেহনত একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

অন্যদিকে হযরত মুফতী আরশাদ সাহেব হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর সঠিক আদর্শে মাদরাসাগুলো সুচারুরূপে পরিচালনা করছিলেন আর হুজুর নিজে অসুস্থ থেকেও তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। পরিপূর্ণ আদর্শ ধরে রেখে কাজগুলো করতে থাকায় বিশেষভাবে দু'আও করছিলেন।

দীর্ঘ প্রায় এক বছরের অভিজ্ঞতায় হুজুর নিজেও আশ্বস্ত হয়েছেন যে ইনশাআল্লাহ তাঁর খেদমাতের এই ধারাবাহিকতা মুফতী আরশাদ সাহেবের হাতে সংরক্ষিত থাকবে এবং সুচারুরূপে পরিচালিত হবে।

আমাদের পর্যবেক্ষণ হলো হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) দ্বীনি খেদমাতের যে প্রকল্পই আরম্ভ করেছিলেন আল্লাহর করুণায় সবগুলোই তাঁর হায়াতে সফলতার মুখ দেখেছে। প্রতিটি প্রকল্পই ক্রম উন্নতি ও বিকাশের পথে রেখে গেছেন তিনি। এই ধারা অব্যাহত রাখতে হলে এই প্রকল্পগুলোর সাথে সংশ্লিষ্টদের মনে প্রাণে তাঁর নীতি ও আদর্শকে মেনে দৃঢ়চিত্তে সে মোতাবেক চলার বিকল্প নেই।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর কর্মময় জীবনের প্রতিটি পদচারণা, বয়ান ও বক্তব্য পুরো মুসলিম উম্মাহের জন্য স্বার্থক জীবনগঠনের পাথেয়। তাই উম্মাহর সামনে তাঁর নীতি-আদর্শ এবং খেদমাতের বিস্তারিত চিত্র লিপিদ্ধাকারে সংরক্ষিত থাকা জরুরী। আমরা আশা করি মারকায কর্তৃপক্ষ দ্রুততম সময়ে এই বিষয়ে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) এর যাবতীয় খেদমাতকে কবুল করুন। তাঁর রূহানী ফয়েজ আমাদের প্রতি জারি রাখুন। আমীন

নির্বাহী সম্পাদক
২৩/১১/২০১৫

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদার ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী

মহান সৃষ্টিকর্তা পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে তাঁর হাবীব মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মহান চরিত্র মাধুর্য প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন- انك لعلى خلق عظيم-

"আপনি অবশ্যই সুমহান চরিত্র বা উদার স্বভাবের অধিকারী।" (আল কলম-৪)

ভালো চরিত্রের তিন ধাপ:

ভালো স্বভাব বা ভালো চরিত্রের কয়েকটি শ্রেণীভেদ রয়েছে। রয়েছে ভালো চরিত্রবান ব্যক্তিগণ একেকজন আরেকজন থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে। সমাজ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ভালো চরিত্রকে সাধারণত তিন ধাপে ভাগ করে থাকেন। (উসুলুদ দাওয়া-৭৯ তাফসীরে রুহুল বয়ান ১০/১০৬)

এক. খুলুকে হাসান (خلق حسن) ভালো চরিত্র। ইসলামী শরীয়তের ভাষায় ভালো চরিত্রের অধিকারী বলতে তাদেরকে বুঝানো হবে, যারা অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার দুর্নীতি থেকে বিরত থাকবে। থাকবে ভালো কাজের জন্য সর্বদা নিবেদিত। তবে নিজের উপর অত্যাচার নির্যাতন চেপে আসলে আত্মরক্ষার জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। অত্যাচার, নির্যাতনের প্রতিউত্তর দিবে সমপরিমাণ প্রতিশোধের মাধ্যমে। অবশ্য কোনো ধরণের বাড়াবাড়ি পরিহার করে সমপরিমাণ প্রতিশোধ ইসলাম সমর্থন করে থাকে। আল কুরআনের ঘোষণা-جزاء سيئة سيئة بمثلها.

"মন্দ কাজের প্রতিশোধ হবে এর সমপরিমাণ । (শুরা-৪১)

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم

যে তোমাদের উপর অতিরঞ্জিত ব্যবহার করে তোমরাও তাদের প্রতি এমনই প্রতিশোধ নিতে পারো। (বাকারা-১৯৪)

উল্লেখ্য যে, ইসলামে সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি থাকলেও এর প্রতি চরমভাবে নিরোৎসাহিত করা হয়েছে। এভাবে প্রতিশোধের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বাড়াবাড়ি করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। এছাড়া খিয়ানতও দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রতিশোধেরও অনুমতি নেই। (আহমদ-৩/৪১৪)

দুই. খুলুকে কারীম (خلق كريم) উত্তম চরিত্র। অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করার প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করেছে। যে মহৎ ব্যক্তি প্রতিশোধের পথে না এগিয়ে ক্ষমার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, মহৎ চরিত্রবান, উত্তম বা শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। অসীম দয়ালু পরম করুণাময় ইরশাদ করেন-

فمن عفى وأصلح فأجره على الله

"যে ক্ষমা করলো ও সন্ধি করলো তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে।" (শুরা-৪১)

উল্লেখ্য যে যারা প্রতিশোধের সুযোগ না খুঁজে ক্ষমার নজীর সৃষ্টি করবে, তারা ভালো চরিত্রবানদের তালিকায় অবশ্যই একধাপ এগিয়ে থাকবেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর শ্বাশত মুক্তির অনুপম বাণীতে এদিকেই নির্দেশ করছেন-

صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك-

তোমার সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সঙ্গে তুমি সম্পর্ক স্থাপন করো। যে তোমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে তার সঙ্গে সদ আচরণ ও অনুগ্রহ করো। সত্য কথা বলো, যদিও তা তোমার নিজেরই বিপক্ষ হয়। (কানযুল উম্মাল-হা.৬৯/২৯)

প্রতিশোধে কল্যাণ নেই:

পাকিস্তান শরীয়াহ আদালতের প্রাক্তন চিফ জাস্টিস, শাইখুল ইসলাম, আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী (দা.বা.) লিখেন, কেউ যদি আপনাকে কষ্ট দেয়, কোনো অনিষ্ট করে, তার প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি শরীয়তে সে পরিমাণ রয়েছে যা আপনার প্রতিপক্ষ করেছে। তবে প্রতিশোধের ব্যবস্থায় মেতে উঠা সময়ের অপচয় বা আরো অতিরিক্ত বিপদের পথে পা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এছাড়া প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যদি বিন্দু মাত্র বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তাহলে রোজ হাশরে এর জবাবদিহি করবে কে? হ্যাঁ! প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার আপনার আছে, তবে তা গ্রহণ অত্যন্ত কঠিন,বিপদ জনক ও জটিল ব্যাপার। তাই নিরাপদ, শান্তিদায়ক ও উত্তম বিনিময়ের কাজ হলো, ক্ষমা করা। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা-ولئن صبر تم لهو خير للصابرين

"যদি ধৈর্য ধারণ করো, তবে তা তাদের জন্য উত্তম। (আন নাহল, ১২৬)

একটু চিন্তা করুন! সবাই যদি এই আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করি, তাহলে এ পৃথিবী থেকে অন্যায় অনাচার, বাড়াবাড়ি চিরতরে বিদায় নেবে। প্রতিষ্ঠা হবে স্বর্গীয় সমাজ। নেমে আসবে ফেরেশতাদের আদর্শ জীবন অনাবিল সুখ-শান্তি।

তিন. ভালো চরিত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়কে কুরআনের ভাষায় খুলুকে আযীম বা উদার চরিত্র ও সুমহান চরিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উদার চরিত্র বলতে কষ্টদাতার প্রতিশোধ না নেয়া এবং ক্ষমা করাই নয় বরং আরো কয়েকধাপ এগিয়ে তাকে উল্টো অনুগ্রহ ও দয়া করাকে বুঝানো হয়। আল্লাহপাক কুরআনে কারীমে ফরমান,

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

তারা রাগ নিয়ন্ত্রণ করে আর ক্ষমা করে, (উপরন্তু তারা অনুগ্রহও করে) আর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহকারীদেরকে ভালোবাসেন। (আলে ইমরান-১৩৪)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদার চরিত্র বা সুমহান ও সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী। এই অগণিত সৃষ্টি জগতে তাঁর কোনো তুলনা নেই। তিনি ক্ষমা করেছেন অত্যাচারী পাষন্ডকে। যাদের নির্মম অত্যাচারে তিনি নিরাশ্রয় তাদের অনুগ্রহ ও দয়ার জন্য তিনি কাতর। তায়েফ, উহুদে যারা রক্ত ঝরালো দানদান শহীদ করলো তাদের নিমিত্তে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেদিন প্রতিজ্ঞাত হচ্ছিল اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون হে প্রভু! আমার জাতিকে তুমি হেদায়াত দান করো! তারা বুঝে না। মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক সুযোগ সত্ত্বেও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যাচারী মক্কাবাসীদের থেকে প্রতিশোধ নেননি। বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি। বরং ঘোষণা করেন, তোমরা আজ মুক্ত। তোমাদের কোনো ভয় নেই। নেই কোনো অনুতাপ অনুশোচনা, বিপদের কোনো ঝুঁকি। শত বছরের শত্রুও সেদিন পরিণত হয়েছিল আপন বন্ধু রুপে। পেয়েছিল তারা উদারতা, বিনয় ও আত্মত্যাগের পরম শিক্ষা, প্রতিশোধের পরিবর্তে ধৈর্য, সহনশীলতা এবং ক্ষমা করার আদর্শ।

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-১২

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে যিকির দ্বিতীয় অধ্যায় :

হাদীস নং ২৩ :

عن انسؓ قال قال رسول الله ﷺ ليس شئ الا بينه وبين الله حجاب الا قول لا اله الا الله ودعاء الوالد

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, প্রতিটি আমলের জন্য আল্লাহর দরবারে পৌঁছতে মাঝখানে পর্দা থাকে। কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সন্তানের জন্য পিতার দু'আ–এই দুটি বিষয়ের জন্য কোনো পর্দা নেই।

(তাফসীরে দুররে মনসূর ৮/৪৯৩, তাম্বীহুল মুমিন ১/৮২ [আনাস রা.], তাফসীরে ইবনে রজব হাম্বলী ২/২৭৮, আদদীবাজ লিল খুতালী ১/৬৭ [ইবনে আব্বাস রা.])

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَؤُهُ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَيْسَ لَهَا دُونَ اللّٰهِ حِجَابٌ حَتّٰى تَخْلُصَ إِلَيْهِ

(তিরমিযী ৫/৫৩৬ হা. ৩৫১৮, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১১/২৯৬ হা. ২০৫৮২, শু'আবুল ঈমান ৩/২৯১ হা. ৩৫৯৫)

হাদীসটির মান : সহীহ লি শাওয়াহিদিহী।

হাদীস নং ২৪ :

سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ، قَالَ: غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ " :لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ :لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ "

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে তার ওপর জাহান্নাম হারাম হবে।

(বুখারী ৮/৯০ হা. ২৪২৩, মুসলিম ১/৪৫৫ হা. ২৬৩, মুসান্নাফে আ. রাজ্জাক ১/৫০২ হা. ১৯২৯, আল মুজামুল কাবীর ১৮/২৮ হা. ৪৮, সহীহে ইবনে হিব্বান ১/৪৫৭ হা. ২২৩)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক. বিভিন্ন হাদীসে এরূপ বান্দাদেরও আলোচনা এসেছে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো ব্যক্তিকে বলবেন, তুমি অমুক গোনাহ করেছ, অমুক গোনাহ করেছ, এভাবে যখন অনেক গোনাহের কথা উল্লেখ করবেন, আর সে মনে করবে যে, আমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি এবং স্বীকার করা ব্যতীত কোনো উপায় থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার অপরাধ গোপন রেখেছি আজও গোপন রাখব। যাও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। কাজেই ওই সকল জাকেরীনের জন্যও যদি এই ধরনের ব্যবহার হয়, তবে তা অসম্ভব নয়।

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ، قَالَ :بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي، مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِهِ، إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :إِنَّ اللّٰهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ :أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ :نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ :(هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلٰى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)

(বুখারী ৩/১৩৭ হা. ২৪৪১, মুসনাদে আহমদ ৯/৩১৮ হা. ৫৪৩৬, সহীহে ইবনে খোজাইমা ১/৩৮৯, ইবনে আবী শায়বা ৭/৮৬ হা. ৩৪২১০)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং ২৫ :

حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :رَأَى عُمَرُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ثَقِيلًا. فَقَالَ :مَا لَكَ يَا أَبَا فُلَانٍ؟ لَعَلَّكَ سَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ يَا أَبَا فُلَانٍ؟ قَالَ :لَا .إِلا أَنِّي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

تَوَفَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةِ هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ :قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ : فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ :بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجَاةُ هَذَا الْأَمْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِّي، فَرَدَّهَا عَلَيَّ، فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের সময় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এত বেশি শোকাহত হয়ে পড়েছিলেন যে অনেকেই বিভিন্ন প্রকার ওসওয়াসায় লিপ্ত হয়ে পড়লেন। হযরত ওসমান (রা.) বলেন, আমিও সেই ওসওয়াসায় লিপ্ত লোকদের মধ্যে ছিলাম। হযরত উমর (রা.) আমার নিকট এসে সালাম করলেন; কিন্তু আমি মোটেও উপলব্ধি করিতে পারিনি। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করলেন (যে, ওসমান (রা.)-কেও অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে। কেননা আমি তাঁকে সালাম করেছি, তিনি সালামের উত্তর পর্যন্ত দেননি) অতঃপর তাঁরা দুজনই আমার নিকট তশরীফ আনলেন এবং সালাম করলেন। হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি তোমার ভাই উমরের সালামের জবাব দিলে না (এর কারণ কী)? আমি আরজ করলাম, কই আমি তো এরূপ করিনি। হযরত উমর (রা.) বললেন, নিশ্চয় করেছেন। আমি বললাম, আপনি কখন এসেছেন বা সালাম করেছেন, তা আমি মোটেও উপলব্ধি করতে পারিনি। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, ঠিক আছে এমনই হয়ে থাকবে; আপনি হয়তো কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। আমি বললাম–জি, হ্যাঁ। আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তা কী ছিল? আমি আরজ করলাম, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকাল হয়ে গেল অথচ এই কাজের নাজাত কিসের মধ্যে সেই কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে রাখতে পারিনি। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করে রেখেছি। এই কথা শুনে আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং বললাম, আপনার ওপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন, এই কথা জিজ্ঞেস করার আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন (কেননা, আপনি দ্বীনের প্রতিটি কাজে অগ্রগামী)। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই কাজের নাজাত কিসে পাওয়া যাবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমাইলেন, যেই ব্যক্তি ওই কালেমাকে গ্রহণ করবে, যা আমি আপন চাচা (আবু তালেবের ওপর তাঁর মৃত্যুর সময়) পেশ করেছিলাম, আর তিনি না করে দিয়েছিলেন তা-ই একমাত্র নাজাতের কালেমা।

(মুসনাদে আহমদ ১/২০১ হা. ২০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১৪ হা. ১, মুসনাদে আবী ইয়ালা ১/৩৯ হা. ১০)

হাদীসটির মান : সহীহ

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

وَسَلَّمَ حَدِيثًا، مَا مَنَعَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ إِلا الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ :إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، إِلا أَشْرَقَ لَهَا لَوْنُهُ وَنَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ .قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ :إِنِّي لأَعْلَمُ مَا هِيَ قَالَ :وَمَا هِيَ؟ قَالَ " :تَعْلَمُ كَلِمَةً أَعْظَمَ مِنْ كَلِمَةٍ أَمَرَ بِهَا عَمَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ :لا إِلَهَ إِلا اللهُ " قَالَ طَلْحَةُ :صَدَقْتَ هِيَ وَاللهِ هِيَ

একদা লোকজন দেখল যে হযরত তালহা (রা.) বিষণ্ন মনে বসে আছেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : আমার এমন একটি কালেমা জানা আছে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তা পড়বে তার মৃত্যুকষ্ট দূর হয়ে যাবে। তার রং উজ্জ্বল হতে থাকবে। কিন্তু আমি উক্ত কালেমা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। (তাই মনোক্ষুণ্ন আছি।) হযরত উমর (রা.) বললেন, আমার ওই কালেমাটি জানা আছে। হযরত তালহা (রা.) আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তা কী? হযরত উমর (রা.) বললেন, আমার জানা আছে, তা হতে শ্রেষ্ঠ কোনো কালেমা নেই, যা তিনি স্বীয় চাচা আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় পেশ করেছিলেন, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হযরত তালহা (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম এটিই, আল্লাহর কসম, এটিই সেই কালেমা।

(মুসনাদে আহমদ ৩/৮ হা. ১৩৮৪, সহীহে ইবনে হিব্বান ১/৪৩৪ হা. ২০৫, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪/২৪৪ হা. ৩৭৯৫, সুনানে কুবরা [নাসাঈ] ৯/৪০২ হা. ১০৮৭১, মুসনাদে আবী ইয়ালা ২/১৪ হা.২৪২, মুজামে কাবীর [তাবরানী ২৪/৩০৪ হা. ৮৮২)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং ২৬ :

أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَحِمَهُ اللهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنُوا عَلَيْهِ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ، قَالَ عُثْمَانُ :وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي ظِلِّ أُطُمٍ مِنَ الْآطَامِ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، فَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهُ مَرَّ وَلا سَلَّمَ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ :مَا يُعْجِبُكَ أَنِّي مَرَرْتُ عَلَى عُثْمَانَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلامَ؟ وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي وِلايَةِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَتَّى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ :جَاءَنِي أَخُوكَ عُمَرُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْكَ، فَسَلَّمَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، فَمَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ :قُلْتُ :مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ :بَلَى وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنَّهَا عُيَيَّتُكُمْ يَا بَنِي أُمَيَّةَ، قَالَ :قُلْتُ :وَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ بِي، وَلا سَلَّمْتَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ :صَدَقَ عُثْمَانُ، وَقَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ؟ فَقُلْتُ :أَجَلْ، قَالَ :مَا هُوَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ :رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

দরসে ফিক্বহ

পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৩

মুফতী শাহেদ রহমানী

ইসলামী পোশাকের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব

সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সব ধর্মের লোকদের নির্দিষ্ট পোশাক থাকে। স্বতন্ত্র পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে আস্তিক-নাস্তিক, মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যে অঘোষিত ঐক্য দেখা যায়। 'আমি অন্যের চেয়ে আলাদা'–মানব মনের এই সুপ্ত ভাবনাকে ইসলাম খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। তাই ইসলাম পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সব ধরনের সাদৃশ্য বর্জনের নির্দেশ দিয়েছে। অন্যের সাদৃশ্য হওয়াকে আরবীতে 'তাশাব্বুহ' বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় 'তাশাব্বুহ'র স্বরূপ ও সংজ্ঞা কী–এ বিষয়ে আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (রহ.) পাঁচটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এক. নিজের আকৃতি, অস্তিত্ব ও সত্তাকে পরিহার করে অন্য জাতির আকৃতি, অস্তিত্ব ও সত্তায় মত্ত হওয়াকেই 'তাশাব্বুহ' বলে।

দুই. নিজের জাতিসত্তাকে অন্যের জাতিসত্তার মধ্যে বিলীন করে দেওয়াকে 'তাশাব্বুহ' বলে।

তিন. নিজের আকৃতি ও গঠনকে পরিবর্তন করে অন্য জাতির আকৃতি ও গঠনকে গ্রহণ করার নামই 'তাশাব্বুহ'।

চার. নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়ে অন্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করাকে 'তাশাব্বুহ' বলে।

পাঁচ. নিজেদের রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও চারিত্রিক গুণাবলির বিকৃতি ঘটিয়ে অন্যদের রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও স্বভাব-চরিত্র গ্রহণ করাকে 'তাশাব্বুহ' বলা হয়।

তাশাব্বুহের প্রকারভেদ ও আহকাম

তাশাব্বুহ বা অন্যের সাদৃশ্য হওয়ার বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় রয়েছে।

কুফর : আক্বিদা, বিশ্বাস ও ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্যের সাদৃশ্য অবলম্বন করা কুফরি। যেমন–মূর্তির সামনে সিজদাবনত হলে নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে যাবে।

হারাম : অন্যের ধর্মীয় প্রথা পালন করা হারাম। যেমন–খ্রিস্টানদের মতো ক্রুশ ব্যবহার, হিন্দুদের মতো পৈতা পরিধান কিংবা কপালে তিলক লাগানো হারাম।

মাকরূহ : অন্য জাতির অভ্যাস, বেশভূষা ও জাতীয় কোনো প্রতীক গ্রহণ করা মাকরূহে তাহরিমী। যেমন–এমন পোশাক গ্রহণ করা, যা নির্দিষ্ট পরিচয় বহন করবে। উদাহরণত হিন্দুদের ধুতি, যোগীদের জুতা ইত্যাদি। একইভাবে কাফেরদের ভাষা, শব্দ উচ্চারণ ও কথা বলার ধরন সাদৃশ্য গ্রহণের নিয়্যাতে রপ্ত করা মাকরূহ। তবে হ্যাঁ, কেবল এই নিয়্যাতে তাদের ভাষা শেখা বৈধ যে এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ জাগতিক বিভিন্ন কাজ সহজ হবে।

মুবাহ : বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রযুক্তির বিভিন্ন উপকরণ, রসদ ও শৃঙ্খলা আইন গ্রহণ করা বৈধ। প্রযুক্তির ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের সঙ্গে তাশাব্বুহের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা এটা আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের ব্যবহার। (সিরাতে মুস্তফা : ৩/৩৯৯-৪০০)

পোশাকে তিন ধরনের সাদৃশ্য বর্জনের নির্দেশ

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে তিন ধরনের সাদৃশ্য বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক. কাফেরদের সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না।

দুই. ফাসেক-পাপাচারীদের মতো পোশাক পরিধান করা যাবে না।

তিন. বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণে পোশাক পরিধান করা যাবে না। অর্থাৎ নারীরা পুরুষদের মতো এবং পুরুষরা নারীদের মতো পোশাক পরিধান করা নাজায়েয।

কাফেরদের অনুকরণে নিষেধাজ্ঞা

আকৃতি-অবয়ব, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন ও কথাবার্তায় কাফের-মুশরিকদের অনুকরণ করা ইসলামে হারাম। মুসলমান হিসেবে নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে এটি সংগতিপূর্ণ নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার দাবি করে, সে কিছুতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের অনুকরণ-অনুসরণ করতে পারে না। ড. ইকবালের ভাষায় :

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود
مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود

অর্থ : চালচলনে তোমরা খ্রিস্টান আর সভ্যতায় হিন্দু।

কেমন মুসলমান, যাদের দেখে ইহুদীরাও লজ্জিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

অর্থাৎ : হে মুসলমানরা! তোমরা জালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না, ফলে জাহান্নামের আগুন তোমাদের গ্রাস করে

ফেলবে। (সূরা হুদ : ১১৩)

এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে বিশেষ নির্দেশনা এসেছে :

خالفوا المشركين (بخارى ٥٨٩٢) لاتشبهو باليهود ولا بالنصارى (ترمذى ٢٦٩٥) خالفوا المجوس (مسلم ٢٦٠)

অর্থাৎ : তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো। ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য অবম্বন করো না। অগ্নিপূজারীদের বিরুদ্ধাচরণ করো।

কাফেরদের সাদৃশ্য বর্জনের কিছু দৃষ্টান্ত

অসংখ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কাফের-মুশরিকদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য অবলম্বন সহ্য করা হয়নি। শরীয়ত এর কিছু দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছে। এখানে সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

পোশাকের ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরোধিতা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে হলদে রঙের দুটি জামা পরিধান করতে দেখে বলেছেন, 'এগুলো কাফেরদের পোশাক। এসব পরিধান করো না।' (মুসতাদরকে হাকেম : ৭৩৯৮)

দাড়ি-গোঁফের ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরোধিতা

দাড়ি-মোচ রাখার ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب (بخارى ٥٨٩٢)

অর্থ : মুশরিকদের বিরোধিতা করো। দাড়ি বাড়তে দাও, আর মোচ ছাঁটাই করো। (বুখারী শরীফ : ৫৮৯২)

অন্য হাদীসে এসেছে :

جزوا الشوارب وارخوا اللحى ، خالفوا المجوس (مسلم ٢٦٠)

অর্থ : মোচ কেটে নাও। দাড়ি লম্বা করো, অগ্নিপূজারীদের বিরোধিতা করো। (মুসলিম শরীফ : ২৬০)

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সেজদা করার ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরোধিতা

নবী করীম (সা.) ইবাদতের ক্ষেত্রে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। এ জন্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ। কেননা, সেই সময় কাফেররা উপাসনা করে থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে :

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ..... ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ (مسلم ٨٣٢)

অর্থ : ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আর কোনো নামায পড়ো না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই পার্শ্বে উদিত হয়। অর্থাৎ শয়তান সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন কাফেররা সূর্যকে পূজা করে। এভাবে আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামায পড়বে না। কেননা শয়তান তখন সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই সময় কাফেররা সূর্যকে পূজা করে। (মুসলিম শরীফ : ৮৩২)

রমাজানের এক দিন আগে রোযা না রাখার ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরোধিতা

শা'বান মাসের শেষের দিকে রমাজানের এক-দুই দিন আগে রোযা রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্যও কাফেরদের সাদৃশ্য বর্জন। কেননা তারা তাদের উপবাস প্রথা পালনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দিনের আগেই তা শুরু করে দেয়। এ জন্য হাদীস শরীফে এসেছে :

لايتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، الا ان يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم (بخارى ١٩١٤)

অর্থ : তোমাদের কেউ রমাজানের এক বা দুই দিন আগে রোযা রাখবে না। তবে ওই দিন রোযা রাখা যার ব্যক্তিগত অভ্যাস, সে রোযা রাখতে পারবে। (বুখারী শরীফ : ১৯১৪)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেছেন :

وانما نهى عنه حذرا من التشبه باهل الكتاب (مرقاة ٤/١٣٧٥)

অর্থাৎ : আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য বর্জনের জন্যই রমাজানের এক-দুই দিন আগে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। (মেরকাত : ৪/১৩৭৫)

আশুরার দিন রোযা রাখার ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরোধিতা

রাসূলুল্লাহ (সা.) আশুরার দিন রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরও এই দিনে রোযা রাখতে উৎসাহিত করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদী-খ্রিস্টানরাও এই দিনকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপন করে থাকে। তারাও এই দিনে রোযা রাখে।" এর জবাবে রাসূল (সা.) বলেছেন, ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিরোধিতা করে আগামী বছর থেকে আমি আশুরা তথা জিলহজের ১০ তারিখসহ ৯ তারিখের রোযা রাখব। (মুসলিম শরীফ : ১১৩৪)

বিষয়টি অন্য হাদীসে আরো স্পষ্টভাবে এসেছে :

صوموا يوم عاشورا وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما (شعب الايمان ٣٥١١)

অর্থ : তোমরা আশুরার রোযা রাখো এবং ইহুদীদের বিরোধিতা করো। সুতরাং জিলহজের ১০ তারিখের আগে এক দিন বা পরে এক দিন রোযা রেখো। (শু'আবুল ঈমান : ৩৫১১)

খিজাব লাগানোর ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরোধিতা

খিজাবের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা খিজাব লাগানোর মাধ্যমে চুলের শুভ্রতা দূর করো। তবে ইহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন

করো না। আর কালো রঙের খিজাব পরিহার করো।' (মুসনাদে কোবরা লিল বায়হাকী : ১৪৮২৩)

নামাযে কোমরে হাত রাখার ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরোধিতা

নামাযে কোমরে হাত রাখা মাকরূহ। হাদীস শরীফে এসেছে :

نهى النبى ﷺ ان يصلى مختصرا (بخارى: ١٢٢٠) قالت عائشة: ان اليهود تفعله (بخارى : ٣٤٥٨)

অর্থ : নবী করীম (সা.) কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ হলো, ইহুদীরা উপাসনা করার সময় এমনটা করে থাকে। (বুখারী শরীফ : ৩৪৫৮)

লাগাতার রোযা রাখার ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরোধিতা

সওমে বিছাল বা লাগাতার রোযা রাখা মাকরূহ। সওমে বিছাল বলা হয় ইফতার না করে বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা। ইসলামী শরীয়তে এটি নিষিদ্ধ। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) লাগাতার রোযা রেখেছেন, কিন্তু সেটি তাঁর বিশেষত্ব ছিল। উম্মতের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়। (বুখারী শরীফ : ১৯৬১) এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, খ্রিস্টানরা সওমে বিছাল রাখে। তাই তাদের বিরোধিতা করে মুসলমানদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা। (মুসনাদে আহমদ : ২১৯৫৬)

পাপাচারী-ফাসেকদের সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে যেভাবে কাফের-মুশরিকদের সাদৃশ্য বর্জন করা জরুরি, একইভাবে ফাসেক-পাপাচারীদের সাদৃশ্য বর্জন করা জরুরি। হাদীস শরীফে এসেছে :

من تشبه بقوم فهو منهم (ابوداود ٤٠٣١)

অর্থ : যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, কিয়ামতের দিন সে ওই জাতির দলভুক্ত হবে। অর্থাৎ ওই দল জান্নাতবাসী হলে সেও জান্নাতবাসী হবে। আর ওই দল জাহান্নামবাসী হলে সেও জাহান্নামবাসী হবে। (আবু দাউদ : ৪০৩১)

তাই যেসব পোশাক নির্দিষ্টভাবে পাপাচারী-ফাসেকরাই পরিধান করে, সেগুলো পরিহার করা জরুরি। এ বিষয়ে ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত হলো :

لو خص اهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه انه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه (الموسوعة الفقية الكويتية ١٢/١١)

অর্থাৎ : যদি কোনো পোশাক পাপাচারী ও অশ্লীল অভিনয়শিল্পীদের নির্দিষ্ট পোশাক হিসেবে গণ্য হয়ে যায়, তাহলে তা পরিধানে অন্যদের বারণ করতে হবে। কেননা অপরিচিত কেউ তাকে দেখে পাপাচারী মনে করবে। সে তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করবে। এতে খারাপ ধারণাকারী খারাপ ধারণার কারণে গোনাহগার হবে। আর ধারণাকৃত ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে এমন মন্দ ধারণা জন্ম দেওয়ার কারণে গোনাহগার হবে।

শার্ট-প্যান্ট পরিধান করার বিধান

রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং জামা, লুঙ্গি, চাদর ও পাগড়ি পরিধান করেছেন। তিনি সালোয়ার কিনে অন্যদের হাদিয়া দেওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত। তাই মুসলমানদের উচিত সুন্নাহসম্মত পোশাক পরিধান করা। পশ্চিমাদের কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা জরুরি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোট-স্যুট ও প্যান্ট-শার্ট পশ্চিমাদের সংস্কৃতি থেকে আমাদের সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়েছে। তাই কাফেরদের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় মৌলিকভাবে এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ারই কথা। এ জন্য প্রথম দিকে মুফতী সাহেবগণ এগুলো পরিধানকে মাকরূহ বলেছেন। মুফতী কেফায়েত উল্লাহ (রহ.) লিখেছেন : 'কোট-স্যুট এখনো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি, বরং এগুলো খ্রিস্টান ও তাদের অনুসারীদের পোশাক। তাই এগুলোর মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান।' (কেফায়াতুল মুফতী : ৯/১৫৯)

আল্লামা জাফর আহমদ থানভী (রহ.) লিখেছেন : 'কোট-স্যুট ইত্যাদি পরিধান করা ইংরেজদের জাতিগত ঐতিহ্য। সুতরাং এটা পরিধান করা মাকরূহ। আর ইচ্ছাকৃত তাদের আদলে জীবন গঠনের নিয়্যাতে এগুলো পরিধান করা হারাম।' (এমদাদুল আহকাম : ৪/৩৪১)

মাওলানা ইউছুফ লুদয়ানুভী (রহ.) লিখেছেন : 'প্যান্ট-শার্ট পরিধান করা মাকরূহে তাহরিমী।' (আপ কে মাসায়েল : ৮/৩৭১)

কিন্তু আজকাল মুসলমানদের মধ্যে কোট-স্যুট, প্যান্ট-শার্ট পরিধান করা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অধিক প্রচলনের কারণে এগুলোকে কাফেরদের ঐতিহ্যবাহী ও জাতিগত নিদর্শনমূলক পোশাক বলা কঠিন। তাই মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী (রহ.) বলেছেন : 'পাক-ভারত উপমহাদেশে কোট-স্যুট পরিধান করা হারাম নয়, তবে এটি নেককার ও ওলী-আউলিয়াদের পোশাক নয়। তাই এগুলো থেকে দূরে থাকা উচিত।' (ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া : ১৯/২৬০) স্মরণ রাখতে হবে, ব্যাপকভাবে প্যান্ট পরিধান করার প্রথা থাকলেও দুটি শর্তে তা পরিধান করা মোবাহ বা বৈধ। এক. টাখনুর নিচে প্যান্ট পরিধান করা যাবে না। দুই. প্যান্ট ঢিলেঢালা হতে হবে। আঁটসাঁট ও চিপা প্যান্ট পরিধান করা হারাম। কেননা এতে লজ্জাস্থান দৃশ্যমান থাকে। আল্লামা তক্বী উসমানী (দা. বা.) লিখেছেন : 'কেউ যদি গুরুত্বের সঙ্গে এ

বিষয়টি আমলে নেয় যে তার প্যান্ট ঢিলেঢালা হবে এবং টাখনুর নিচে তা পরিধান করবে না, তাহলে এমন প্যান্ট পরিধান করা বৈধ। যদিও তা অনুত্তম।' (এসলাহী খুতুবাত : ৫/২৯৪)

নারীদের জন্য শার্ট-প্যান্ট পরিধানের বিধান

ওপরে প্যান্ট সম্পর্কে যে আলোচনা করা হলো, তা কেবল পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। নারীদের জন্য প্যান্ট পরিধান করা জায়েয নেই। কেননা প্রথমত, এটি কাফেরদের সাদৃশ্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, এটি পুরুষদের সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক। হাদীস শরীফে এমন সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরিধানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, প্যান্ট পুরুষদের তুলনায় নারীদের জন্য অধিক লজ্জাহীনতা, পর্দাহীনতা ও উলঙ্গপনার কারণ। এ জন্য নারীদের সর্বাবস্থায় এটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত। আর বর্তমানে চুরি বা কুঞ্চিত পায়জামার প্রচলন ঘটেছে। এটা আর প্যান্টের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটা পরিধান করলেও নগ্নতা প্রকাশিত হয়।

কলারবিশিষ্ট জামাকাপড়ের বিধান

মাওলানা যুফার আহমদ উসমানী (রহ.) লিখেছেন, 'এতে সন্দেহ নেই যে কলার লাগানো খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ। তাই এটা নাজায়েয।' (এমদাদুল আহকাম : ৪/৩৩৫)

মাওলানা ইউছুফ লুদয়ানুভী (রহ.) বলেন, 'কলার লাগানো ইংরেজদের ঐতিহ্য। মুসলমানদের তা বর্জন করা উচিত। (আপ কে মাসায়েল : ৮/৩৭০)

কিন্তু এখন মুসলমানদের মধ্যে কলারবিশিষ্ট জামার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে। ফলে একে কাফেরদের ঐতিহ্যবাহী ও জাতিগত পোশাক বলা কঠিন। কিন্তু তার পরও যথাসম্ভব এ থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। কেননা এটি সালেহীন ও নেককারদের পোশাক নয়। মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী (রহ.) লিখেছেন : এখন এটি কাফের-মুশরিক ও ফাসেকদের নিদর্শনসম্বলিত পোশাক নয়। তাই এটি তাদের সাদৃশ্যপূর্ণও নয়। (ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ১৯/২৬৭)

গলায় টাই ঝোলানোর বিধান

গলায় টাই ঝোলানো মুসলমানদের পোশাক নয়। এটা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অংশ। সুতরাং এটা বর্জন করা উচিত। মাওলানা ইউছুফ লুদয়ানুভী (রহ.) লিখেছেন : আমি কোনো একটি গ্রন্থে অধ্যয়ন করেছি যে, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটেনিকার যখন প্রথম সংস্করণ বের হয়েছে, তখন টাই সম্পর্কে লেখা ছিল যে এটা খ্রিস্টানদের ক্রুশ চিহ্নের নিদর্শনস্বরূপ খ্রিস্টানরা গলায় ঝুলিয়ে থাকে। কিন্তু এই এনসাইক্লোপেডিয়ার পরবর্তী সংস্করণগুলোতে এ কথা পাল্টে দেওয়া হয়েছে। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে বলা যায়, পৈতা পরা যেমন হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতীক, একইভাবে টাই ব্যবহার খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক। আর অন্য জাতি বা ধর্মের লোকদের ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী কোনো কিছু গ্রহণ করা নাজায়েয। এটি ইসলামী মর্যাদাবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।' (আপ কে মাসায়েল : ৮/৩৭১)

কিন্তু বর্তমানে টাই লাগানোও মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক হয়ে গেছে, এখন আগের মতো সাদৃশ্যের অর্থ কার্যকরও নয়, তাই টাই ব্যবহারে আগের মতো কঠোরতা আরোপ করা হবে না। তবে এটিও নেককার ও সালেহীনদের পোশাক নয় বলে বর্জন করা উচিত। মুফতী মাহমুদ হাসান (রহ.) লিখেছেন : টাই একসময় খ্রিস্টানদের নিদর্শন ছিল। তখন এর হুকুমও কঠোর ছিল। এখন অন্যদের মধ্যেও অধিকহারে এর ব্যবহার দেখা যায়। অনেক মুসলমানও টাই পরে থাকে। তাই এখন বিধানে কিছুটা শিথিলতা এসেছে। এখন এটাকে শিরক বা হারাম বলা যাবে না। তবে এখনো এটা পরিধান করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে পছন্দনীয় নয়। (ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ১৯/২৮৯)

বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য অবলম্বনে নিষেধাজ্ঞা

সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষ অসমান। ভেতরে-বাইর, জাহের-বাতেন ও বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে প্রাকৃতিক নিয়মেই নারী-পুরুষের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই এটা কিছুতেই সংগত ও যুক্তিযুক্ত হতে পারে না যে, তারা একে-অন্যের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে। এমন সাদৃশ্য অবলম্বনকারীদের আল্লাহর অভিশপ্ত হওয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। এখানেও অন্যের সাদৃশ্য বর্জনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

নারী-পুরুষ একে অন্যের সাদৃশ্য অবলম্বনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

নারী-পুরুষ একে অন্যের সাদৃশ্য অবলম্বনের বিরুদ্ধে ইসলামে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। তাই চালচলন, ফ্যাশন, পোশাক পরিধান ও সাধারণ অভ্যাসের ক্ষেত্রে একে-অন্যের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে নিম্নে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো :

عن ابن عباسؓ قال: لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (بخارى ٥٨٨٥)

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সা.) লা'নত করেছেন নারীদের সাদৃশ্যগ্রহণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের সাদৃশ্যগ্রহণকারী নারীদের। (বুখারী শরীফ : ৫৮৮৫)

উল্লিখিত হাদীস নারী-পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণের বিধানের ক্ষেত্রে ব্যাপক। পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

ثلاثة لاينظر الله اليهم يوم القيامة : العاق بوالدين ومدمن خمر ومنان

وثلاثة لايدخلون الجنة : الرجل يلبس بلبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل والديوث (شعب الايمان ٧٤١٧)

অর্থ : তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। এক. মাতা-পিতার অবাধ্য। দুই. মদ্যপায়ী। তিন. উপকার করে খোঁটা দানকারী। আর তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক. নারীদের পোশাক পরিধানকারী পুরুষ। দুই. পুরুষদের পোশাক পরিধানকারী নারী। তিন. দয়ুছ (ওই পুরুষ, যার স্ত্রী বা অধীনস্ত নারীরা ঘরে-বাইরে পরপুরুষের সঙ্গে উঠাবসা করে। কিন্তু তার আত্মমর্যাদায় বাধে না এবং সে বাধাও প্রদান করে না)। নবী করীম (সা.) অভিশাপ দিয়েছেন সেসব পুরুষদের, যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং সেসব নারীদের, যারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে। (শু'আবুল ঈমান : ৭৪১৭)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক মহিলাকে পুরুষদের মতো জুতা পরিধান করতে দেখে তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। (শু'আবুল ঈমান : ৭৪১৮)

নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক পার্থক্য ধরে রাখতে হবে জীবনের সব ক্ষেত্রে। হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) নারী হতে চায়, এমন পুরুষদের এবং পুরুষ হতে চায়, এমন নারীদের অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, ঘর থেকে তাদের বের করে দাও। (শু'আবুল ঈমান : ৭৪২০) (বুখারী শরীফ : ৫৮৮৬)

অন্য হাদীসে এসেছে :

ان خير شبابكم من تشبه بشيوخكم وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم وشر نسائكم من تشبه برجالكم وشر رجالكم من تشبه بنسائكم (شعب الايمان : ٧٤٢٠)

অর্থ : যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তাদের পূর্বসূরি বয়োবৃদ্ধদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী। নিকৃষ্টতম বৃদ্ধ তো তারাই, যারা যুবকদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী। নিকৃষ্টতম নারী তারাই, যারা পুরুষদের অনুগামী, আর নিকৃষ্টতম পুরুষ তারাই, যারা নারীদের অনুকরণ-অনুসরণ করে। (শু'আবুল ঈমান : ৭৪২০)

নারী-পুরুষের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি ইসলাম খুবই কঠোরভাবে দেখেছে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال

অর্থ : পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীরা আমাদের দলভুক্ত নয়। নারীদের সাদৃশ্যপূর্ণ পুরুষরা আমাদের দলভুক্ত নয়। (মুসনাদে আহমদ : ৪৬২)

ইসলামের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় উমর (রা.)-এর অবদান

কাফেরদের সাদৃশ্য হওয়ার মাধ্যমে ইমান ও কুফর, মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যকার স্বাতন্ত্র্য শেষ হয়ে যায়। তখন কে কাফের, আর কে মুসলমান–এই পার্থক্য থাকে না। যেমনটা আজকাল মিশ্র সংস্কৃতির মানুষের চালচলন দেখলে পরখ করার উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। আসলে এটা কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়। এর ফলে একসময় ইসলামের আকৃতিই পরিবর্তন করে ফেলার পথ প্রশস্ত হচ্ছে। হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে গোটা পৃথিবীতে যখন ইসলামের বিজয় নিশান উড়তে লাগল, তখন তিনি বিষয়টি উপলব্ধি করলেন যে মিশ্র সংস্কৃতির ফলে ইসলামের স্বাতন্ত্র্য লীন হয়ে যাবে, ইসলামী সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটবে, তখন তিনি এই মর্মে রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করেন যে মুসলিম-অমুসলিম একে-অন্যের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে পারবে না। একে-অন্যের মতো পোশাক পরিধান করা যাবে না। প্রত্যেককেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে হবে। [সিরাতে মুস্তফা, ইদ্রিস কান্ধলভী (রহ.)]

তিনি মুসলমানদের জন্য এই ফরমান জারি করেছেন :

واياكم والتنعم وزى اهل الشرك ولبوس الحرير (مسلم ٢٠٦٩)

অর্থ : তোমরা বিলাসী জীবন যাপন পরিহার করো। মুশরিকদের পোশাক ও রেশমি কাপড় পরিধান করা থেকে দূরে থাকো। (মুসলিম শরীফ : ২০৬৯)

কাফেরদের জন্য তিনি এই ফরমান জারি করেছেন যে, তারা এসব বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হবে :

ولا تشتبه بهم فى شئ من لباسهم قلنسوة، او عمامة، او فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتنى بكناهم (اقتضاء الصراط المستقيم ١/٣٦٣)

অর্থ : কোনো কিছুতে আমরা (কাফেররা) মুসলমানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করব না। তাদের মতো টুপি, পাগড়ি পরিধান করব না। মাথার সিঁথি কাটব না। তাদের স্টাইলে কথা বলব না। তাদের নাম বা উপনামে আমাদের কারো নাম রাখব না। (ইকতেজাউস্ সিরাতিল মুস্তাকীম : ১/৩৬৩)

এভাবেই মুসলিম সংস্কৃতি রক্ষায় হযরত উমর (রা.) যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই ঘটনা থেকে আমরা আরো একটি বিষয় উপলব্ধি করতে পারি যে সংস্কৃতি কিছুতেই ধর্মের প্রভাবমুক্ত নয়। তাই কোনো জাতির সংস্কৃতিতে তাদের ধর্মীয় প্রভাব অবশ্যই থাকবে। সে অর্থে মিশ্র সংস্কৃতি হলো, এক ধর্মের সংস্কৃতিতে অন্য ধর্মের সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতেই হবে। স্মরণ রাখতে হবে, ধর্ম দর্শন বাদ দিয়ে সংস্কৃতি চর্চা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

সুন্নাতের গুরুত্ব :

সম্পর্ক স্থাপনের আসল মাপকাঠি হলো সুন্নাতের অনুসরণ। যে ব্যক্তি পুরোপুরিভাবে সুন্নাতের ওপর উঠে আসবে তার নিসবত পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্তরে যা থাকে তা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়।

মুস্তাহাব কাজের জন্য ফরজ ছাড়া যাবে না :

অনেকে আলেম হয়ে যান; কিন্তু অন্তর আমলবান্ধব হয় না। এক আলেম ছিলেন। খুবই প্রসিদ্ধ। এশার পর দেড়-দুইটা পর্যন্ত ওয়াজ মাহফিল করেন। কিন্তু সকালে ৮টার আগে ঘুম থেকে ওঠেন না। অর্থাৎ ফরজ পর্যন্ত পড়েননি। অথচ ওয়াজ ছিল মুস্তাহাব কাজ। মুস্তাহাবের জন্য ফরজ কিভাবে ছেড়ে দেবেন? সুতরাং ফরজ কাজ ছাড়ার পেছনে যে কারণটি বিদ্যমান অর্থাৎ ওয়াজ এবং বয়ান তা ঠিক হলো না।

কবীরা গোনাহ তাওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না :

ছোট ছোট গোনাহসমূহ ওজু, নামায ইত্যাদি ইবাদাতের দ্বারা ক্ষমা হয়ে যায়। আর কবীর গোনাহ হলো সাপ-বিচ্ছুর মতো। এসব গোনাহ মানুষের নামায-রোযা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে এবং তাওবা ছাড়া তা ক্ষমা হয় না।

মানুষের গোনাহ থেকে বাঁচা আবশ্যক :

মানুষ তাকওয়া গ্রহণ করবে। এর দ্বারা রিযিকও বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে দ্বীনি কাজ সহজ হয়। তাকওয়া গ্রহণকারীকে আল্লাহ তা'আলা এমন স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। তাই ভাইয়েরা! গোনাহ থেকে বাঁচা আবশ্যক।

কোরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি :

রমাজানের আমলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত। তিলাওয়াত বললে আমরা বুঝি এক পারা থেকে ৩০ পারা পর্যন্ত তিলাওয়াত করা। বরং তিলাওয়াত হলো কোরআন পাঠ করা। ধরুন, কোনো লোক পুরো কোরআন মজীদ পড়েনি। অথচা কয়েকটা সূরা পড়েছে। কিংবা কয়েকটা সূরাই স্মরণ আছে। এবং সে সূরাগুলোই পড়েছে। এটিও তিলাওয়াত। ফজরের পর একবার সূরা ইখলাস, সূরায়ে ফালাক, সূরায়ে নাস পড়লে হেফাজতে থাকে। একবার সূরায়ে ইয়াসীন পড়ে নাও। এটিও তিলাওয়াত। এরূপ নিয়মিত করলে সারা দিনের কাজের মধ্যে বরকত হয় সহজ হয়।

পবিত্র কোরআন হিফজ করার সহজ পদ্ধতি :

পবিত্র কোরআন হিফজ করার সহজ পদ্ধতি হলো, প্রতিটি দিন এক আয়াত বা একটি বাক্য মুখস্থ করো। মারাকশে নিয়ম আছে যে, মুসল্লীগণ নামায আদায় করে বসে পড়বেন। ইমাম সাহেব একটি আয়াত পড়িয়ে দেবেন। মুসল্লীগণ ওই আয়াতটি মুখস্থ করবেন। এভাবে তাঁরা পবিত্র কোরআন মজীদ হিফজ করে নেন। যাঁর যেটুকু সময় দেওয়ার অবকাশ থাকে সেটুকু সময় তাঁরা দিয়ে থাকেন। কেউ আধা ঘণ্টা, কেউ ১০ মিনিট উক্ত আয়াত মুখস্থ করার কাজে ব্যয় করেন। অনেকে এভাবে প্রয়োজনীয় সূরাগুলোও মুখস্থ করেন, অনেকে পুরো কোরআন। খুব সহজে তাঁরা এসব কাজ করে থাকেন। সে দেশে ১০০% মুসলমানই নামাযী। আবার সকলে মসজিদে এসে নামায পড়েন। সাধারণ লোকজন তো আছে, মন্ত্রী-মিনিস্টাররাও মসজিদে এসে নামায পড়েন। ধর্মের গুরুত্বের কারণেই মূলত এভাবে করে থাকেন। যেখানেই ধর্মের গুরুত্ব থাকবে, সেখানে এরূপ করা সম্ভব ও সহজ।

রোযার বাহ্যিক উপকারিতা :

রোযা গোনাহ থেকে রক্ষা করে, যা আধ্যাত্মিক উপকার। তেমনি রোযার মাধ্যমে দৈহিক রোগেরও উপশম হয়। কারণ অধিকাংশ রোগবালাই খানাপিনার অসাবধানতার কারণে সৃষ্টি হয়। এটি আল্লাহর নেজাম। রোযার কারণে খানাপিনার অসাবধানতা হ্রাস পায়। সে কারণে রোগবালাই কম হয়।

মসজিদ নির্মাণে সাহায্য-সহযোগিতার সাওয়াব :

পাখির বাসার মতোও যদি কেউ মসজিদ বানায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে অট্টালিকা তৈরি করেন। অথচ পাখির বাসার মতো মসজিদ হয় না। তাই এর অর্থ হলো, মসজিদ নির্মাণের সাহায্যে কেউ যদি পাখির ঘরের পরিমাণও অংশ নেয় তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মহল তৈরি করবেন। অর্থাৎ যার যতটুকু সম্ভব অংশ নেওয়া, হোক তা অতি সামান্য, নগণ্য। এরূপ সাহায্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকে।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

হারাম উপার্জনের ভয়াবহতা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

لا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَلا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّءِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ

কোনো বান্দা হারাম মাল উপার্জন করবে অতঃপর তা থেকে সদকা করবে আর আল্লাহ তা কবুল করবেন(?) এমনটা হতে পারে না। এটাও হতে পারে না যে সে তা হতে আল্লাহর পথে খরচ করবে আর আল্লাহ তাতে বরকত দেবেন। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় হারাম মাল উত্তরসূরিদের জন্য রেখে যাবে, তবে এই মাল তার জন্য জাহান্নামের পাথেয় হবে। আল্লাহ তা'আলা মন্দকে মন্দ দ্বারা মোছেন না। বরং মন্দকে নেকী দ্বারা মিটিয়ে দেন। চিরন্তন সত্য হলো, নাপাকীকে নাপাকী দ্বারা ধোয়া যায় না। (মিশকাত, পৃ. ২৪২)

হাদীস থেকে বুঝে আসে, হারাম মালের সদকা কবুল হয় না। হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদে বরকত হয় না। হারাম মাল উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যাওয়া এবং তাদেরকে ভোগ করতে দেওয়া সবই গোনাহ। অথচ হালাল মাল উত্তরসূরিদের জন্য রেখে যাওয়া এক প্রকার সদকা। হাদীস থেকে আরো বুঝে আসে, দান-সদকা হালাল ও পবিত্র মাল থেকে হলে সেটা গোনাহের প্রায়শ্চিত্ত ও মাগফিরাতের উসিলা হতে পারে। কিন্তু হারাম মাল নাপাক ও অপবিত্র। অতএব হারাম মালের সদকা গোনাহের অপবিত্রতাকে দূর করতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। যেমন– প্রস্রাব দ্বারা নাপাক কাপড় ধুলে পবিত্র হয় না। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ :(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (المؤمنون٥١) وَقَالَ :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة١٧٢) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্রতাকেই কবুল করেন। তিনি মুমিনদেরকে তা-ই নির্দেশ করেছেন, যা রাসূলগণকেও করেছেন। তিনি রাসূলগণকে খেতাব করে বলেন, হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল খানা ভক্ষণ করো এবং নেক আমল করো। আর মুমিনদেরকে খেতাব করে বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা আমার দেওয়া রিজিক থেকে হালাল রিজিক ভক্ষণ করো। এরপর রাসূল (সা.) এমন একজন মুসাফিরের কথা উল্লেখ করেন যে বহুদূর সফর করে কোনো পবিত্র স্থানে এমন হালতে যায় যে তার চুল এলোমেলো, শরীর ও কাপড় ধুলামিশ্রিত এমতাবস্থায় সে আকাশের পানে হাত উঠিয়ে দু'আ করতে থাকে– হে আমার রব! হে আমার রব বলে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার বেড়ে ওঠা! তবে এ ধরনের লোকের দু'আ কিভাবে কবুল হবে। (মুসলিম)

হাদীস থেকে বুঝে আসে, হারাম থেকে বেঁচে হালাল ভক্ষণ এবং হালাল ব্যবহারের যে হুকুম আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে দিয়েছেন একই হুকুম তিনি মুমিনদেরকেও দিয়েছেন। অতএব প্রত্যেক মুমিনকেই আল্লাহর হুকুমের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করা চাই। আরো বুঝে আসে, হারাম মাল এত বেশি অপয়া যে, কোনো ব্যক্তি মাথা থেকে পা পর্যন্ত দরবেশ ও

করুণার পাত্র হলেও তার দু'আ কবুল হবে না; যদি তার আহারীয় এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই হারাম হয়। হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ ، قَالَ :ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ :صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ

যে ব্যক্তি দশ টাকা দিয়ে একটি কাপড় খরিদ করল; যার মধ্যে একটি টাকা হারাম উপার্জিত। তাহলে ওই কাপড় শরীরে থাকা পর্যন্ত তার কোনো নামাযই আল্লাহ কবুল করবেন না। এ কথা বর্ণনা করে ইবনে উমর (রা.) দুটি আঙুল দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে বলেন, এ কথা আমি রাসূল (সা.) থেকে না শুনে থাকলে আমার কান বধির হয়ে যাক। অর্থাৎ আমি যা বলেছি রাসূল (সা.) থেকে শুনেই বলেছি। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

لايدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولى به

হারাম দ্বারা বেড়ে ওঠা শরীর জান্নাতে যেতে পারবে না। হারাম দ্বারা বেড়ে ওঠা শরীরের উপযুক্ত স্থান জাহান্নাম। (আহমদ)

হাদীস থেকে প্রতিভাত হয়, হারাম আহারে-বসনে লালিত-পালিত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জাহান্নামই তার ঠিকানা। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

ياتى على الناس زمان لايبالى المرء ماخذ منه امن الحلال ام من الحرام

একটি যুগ আসবে, যখন মানুষ এটার পরোয়া করবে না যে সে হালাল নিচ্ছে নাকি হারাম। (বুখারী)

হাদীসের ভাষা স্পষ্ট, সন্দেহ নেই সেই যুগ এসে গেছে, যা হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। কারণ সমাজে আজ যাদেরকে দ্বীনদার শ্রেণীর বলে জ্ঞান করা হয় তারাও উপার্জনে হারাম-হালালের তোয়াক্কা করে না। সামনে হয়তো আরো খারাপ সময় অপেক্ষমাণ। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সর্বপ্রকার হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমীন।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

লা-মাযহাবী ফিতনা ও কিছু কথা

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

গত ২৯ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার কক্সবাজার জেলা ইমাম পরিষদের উদ্যোগে কক্সবাজার লালদিঘীর পাড় ময়দানে (হোটেল পালংকিসংলগ্ন, মাঠ) বর্তমানে লা-মাযহাবীদের সৃষ্ট ফিতনার বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ছিলেন ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (রহ.)। সমাবেশে উপস্থিতির একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতির একপর্যায়ে হযরত সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। মাঝে সামান্য সময়ের জন্য চেতনা ফিরে পেলে নিজের পরিবর্তে (মুহিউস্‌সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ারর প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদীস) স্নেহভাজন মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.-কে উক্ত সমাবেশে বয়ানের নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত ফকীহুল মিল্লাতের অন্তিম মুহূর্তের নির্দেশ পালনার্থে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. উল্লিখিত সমাবেশে আহলে হাদীসের ফিতনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দেড় ঘণ্টাব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করেন। মূল্যবান বয়ানটি দেশব্যাপী সকল হকপসনদ ও সত্যানুসন্ধানী পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মাসিক 'আল-আবরার'-এ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলো। –

আল-আবরার পরিবার

হামদ ও সালাতের পর

সম্মানিত উপস্থিতি!

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান সাহেবের দিলের তামান্না ও আকাঙ্ক্ষা ছিল তিনি নিজেই আপনাদের সম্মেলনে আসবেন; কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় আমাকে আদেশ করেছেন। হয়তো সেই আবেগের কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। নতুবা আমি এর 'আহাল' নই ।

আজকে আমাকে লা-মাযহাবী বিষয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। তারা মূলত জন্ম নিয়েছে ইংরেজদের পিরিয়ডে। যখন উলামায়ে দেওবন্দ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া দিয়েছেন তখন এরা মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভীর নেতৃত্বে ইংরেজদের পক্ষে ফতওয়া দিয়েছে যে, 'ইংরেজরা আল্লাহর রহমত, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম..."!

ওই সময় তাদের নাম ছিল মুহাম্মদী, গাইরে মুকাল্লিদ, অর্থাৎ তারা চার মাযহাবের কোনো মাযহাব মানে না।

অথচ তাবীঈদের যামানা থেকেই চলে আসছে এই চারটি মাযহাব এবং দুনিয়ার সমস্ত উলামাদের 'ইজমা' হয়ে গেছে যে, আল্লাহকে পেতে হলে, মুক্তি পেতে হলে যে যে এলাকায় আছে, সে ওই এলাকায় প্রচলিত মাযহাব মতো চলতে হবে।

যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের সকল মুফতী হানাফী মাযহাবের। অতএব আমাদেরকে হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে। এখানে অন্য কোনো মাযহাব মানলে চলবে না। মালয়েশিয়ার সকল মুফতী শাফেঈ মাযহাবের। অন্যদিকে লোহিত সাগরের ওপারে আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো ইত্যাদি দেশে মালেকী মাযহাবের মুফতী আছে। ওই সব দেশে যারা থাকে তাদেরকে মালেকী মাযহাব মানতে হবে। আরব ভূখণ্ডে আছেন হাম্বলী মাযহাবের মুফতীগণ। সুতরাং ওখানে যাঁরা আছেন তাঁরা হাম্বলী মাযহাব মেনে চলবেন।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হায়াতে প্রত্যেক এলাকার লোকদেরকে ওই এলাকার 'গভর্নর সাহাবী'কে অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল। যেমন–ইয়ামানবাসীদেরকে মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল। তারপর নবীজির ইন্তেকালের পর প্রতিটি শহরে একেকজন মুফতী সাহাবী বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেমন–মক্কায় আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), মদীনায় যায়েদ বিন সাবিত (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ। তাঁরা সারা জীবন ফতওয়া-ফারায়েজ দিয়ে গেছেন। সুতরাং ওই সাহাবীদের ভিন্ন মাযহাব ছিল। ওইগুলো পরে কয়েকজন মুজতাহিদ ইমাম সব এক জায়গায় করেন। এরপর দেখা গেল ১০-১২টি মাযহাব হয়ে গেছে। ১০-১২টি থেকে আল্লাহর মঞ্জুর হিসেবে হলো চারটি। অন্যগুলো বাদ গেল কিভাবে? অন্য মাযহাবগুলো ঠিক ছিল। তাদের জীবদ্দশায় তাঁদের মাযহাব অনুযায়ী চলার অনেক লোক ছিল। কিন্তু তাঁরা যে কিতাব লিখে গেছেন হাদীস ও কোরআনের আলোকে এতে জীবনের সব সমস্যার সমাধান ছিল না। কারো আট আনা সমাধান আছে, কারো চৌদ্দ আনা সমাধান আছে...। এ কারণে বাকি মাযহাবগুলো অটোমেটিক বাদ হয়ে গেল। তাঁরা ইমাম ছিলেন। কিন্তু তাঁদের লেখার মধ্যে জীবনের ষোলো আনা

প্রয়োজনের সমাধান আসেনি।
না আসার কারণে তাঁদের অনুসারী যারা ছিল, তারা যখন তাদের ঈমামের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের কোনো সমাধান পেল না, তখন তালাশ করল যে, কোন ইমামের মাযহাবে ষোলো আনা সমাধান আছে? তারপর তারা ওই মাজহাবে চলে গেল। এভাবে ওই ১২টি থেকে কমতে কমতে আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী চারটি টিকল। এই চারজন জীবনের শুরু থেকে কাফন-দাফন পর্যন্ত সব সমাধান কোরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত লিখে দিয়ে গেছেন ।
আমরা চার মাযহাবের সকলেই মিলেমিশে আছি। আমাদের কেউ একে-অপরের কোনো সমালোচনা করে না। কোনো হানাফীকে দেখবেন না কোনো শাফেঈর বিরুদ্ধে বলছে। আবার কোনো শাফেঈকে দেখবেন না হানাফীদের বিরুদ্ধে বলছে। তেরো শ বছরের মধ্যে কোথাও কোনো ঝগড়া হয়নি। কোথাও শুনবেন না যে এক মাযহাবের অনুসারী অন্য মাযহাবের অনুসারীকে বলছে, এই তোমার তো নামায হয় না! তোমার নামায তো হাদীসের সঙ্গে মেলে না বা তোমরা ইমাম মেনে বেঈমান হয়ে গেছ! এমন কোনো নজির নেই। তবে চার মাযহাবের মাসআলার মধ্যে কিছু কিছু মতপার্থক্য আছে। ঈমানের ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। এ ক্ষেত্রে চার মাযহাবই এক। আমীন আস্তে বলবে না জোরে বলবে? হাত নাভির নিচে বাঁধবে না বুকের ওপরে? এ-জাতীয় কিছু মাসআলার মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মাযহাবের দলিল রয়েছে। সবই হাদীসের কিতাবাদি বিদ্যমান। কিন্তু দীর্ঘ ১৩/১৪শ বছরের এই বাস্তবতায় আপনি কোথাও ঝগড়া দেখবেন না।
বর্তমানে লামাযহাবীগণ হাদীসের কিতাবে অন্য মাযহাবের যে দলিলগুলো রয়েছে তা সাধারণ মানুষের সামনে পেশ করে বলে যে এই দেখো হাদীসে এভাবে রয়েছে অথচ তোমার নামায হাদীস অনুযায়ী হয়নি। সুতরাং তোমার নামায হয়নি! অথচ হাদীসের কিতাবে অনেক হাদীস এমন রয়েছে, যা রহিত হয়ে গেছে, যার ওপর আমল করা নিষেধ। যেগুলো রহিত হয়ে গেছে সেগুলো কি হাদীসের কিতাবে আছে, না বের করে দেওয়া হয়েছে? উলামায়ে কেরাম জানেন যে সেগুলো হাদীসের কিতাবে আছে। অন্যথায় ইসলামের ইতিহাসে কখন কী ঘটেছিল, সে ইতিহাস আমাদের অজানা রয়ে যেত। এই রহিতগুলোকে হাদীস থেকে বের করা হয়নি। সবই রেখে দেওয়া হয়েছে। যেমন ধরুন–
একসময় নামাযে কথা বলা যেত, এখন বলা যায় না। অথচ সে হাদীস এখনো কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। (মুসলিম হাদীস নং ৫৪০, নাসায়ী হাদীস নং ১১৮৮)
* অনুরূপ জিলহজ মাসের এগারো-বারো তারিখের রোযা রাখার কথা বুখারী শরীফে আছে, যা একসময় বৈধ ছিল, পরে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। (বুখারী হাদীস নং ১৯৯৬)
* একসময় ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েয ছিল; কিন্তু এখন মাকরূহ।
* আগুনে পাকানো কিছু খেলে একসময় ওজু করতে হতো, এখন তা করতে হয় না। (মুসলিম, হাদীস নং ৩৫১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭৬০৫) এমন অসংখ্য রহিত হাদীস কিতাবে বিদ্যমান আছে। এখন এই লোকগুলো সেই রহিত হাদীস এনে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, আর বলে যে 'তোমরা তো এই হাদীসের ওপর আমল করো না!" তাহলে বিষয়টি কেমন হবে? এই হাদীসের ওপর আমল করা কি জায়েজ আছে? আমি দেখালাম–
* বুখারী শরীফের মধ্যে জিলহজের এগারো-বারো তারিখে রোযার কথা আছে, যা রহিত হয়ে গেছে।
* স্ত্রীর কাছে গেছে, সব কিছু হয়েছে, কিন্তু বীর্যপাত হয়নি; বুখারীতে আছে গোসল ফরজ হয়নি! অথচ নবীজির পরবর্তী নির্দেশ– 'দুজনের খাতনার স্থান একসাথে হলে গোসল ফরজ হয়ে যায়'–দ্বারা পূর্বেরটা তথা বুখারী শরীফেরটা রহিত হয়ে গেছে। (বুখারী, হাদীস নং ১৭৯.২৯৩ , মুসলিম হাদীস নং ৩৪৯)
এমন অনেক হাদীস রহিত হয়ে গেছে, যা বুখারীতে আছে। অথবা এমন কিছু হাদীস আছে, যা নবীজির সাথে খাস উম্মতের জন্য তার ওপর আমল করা জায়েয নেই। তারা এগুলো এনে ফিতনা করছে। লোকদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আমাদের লোকেরা কি আলেম- উলামাদের বয়ান শোনেন না? নাকি যাঁর যাঁর মতো আমল করেন? আলেমরা তো সহীহ কথাই বলছেন। তাঁরা কি হাদীস বোঝেন না? এ যুগে হাদীস পড়ান কারা? হানাফী উলামাগণ না গায়রে মুকাল্লিদরা?
তাঁদের এক নাম গায়রে মুকাল্লিদ আরেক নাম মুহাম্মাদী আরেক নাম হলো আহলে হাদীস। তারা একেক সময় একেক নাম ব্যবহার করে। 'আহলে হাদীস' নামটা আগে ছিল না। এটা তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পাস করিয়ে নিয়েছে। আমার লেখা 'মাজহাব ও তাকলীদ' নামক বইতে তাদের নাম পাস করানোর বিস্তারিত ইতিহাস আমি লিখেছি (পৃ. ১৫৯)। মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন করেছিল :
"আমরা আপনাদের পক্ষে কাজ করতে চাই; কিন্তু পারছি না। লোকেরা আমাদের কাছে ভিড়ছে না, আমাদের নামটা আহলে হাদীস পাস করিয়ে দেওয়া হোক। তাহলে জনগণ আমাদেরকে অনুসরণ করবে।"
আহলে হাদীস ইংরেজের লোক, এরা মুসলমানদের লোক নয়। এদের কাজই হলো ফিতনা করা। তারা আমাদের নামায অশুদ্ধ দাবি করে আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে গালমন্দ করে এবং তারা বলে যে মাযহাব মানা শিরক!

আমরা কি ইমাম আবু হানীফাকে খোদা বা নবী মানি? তাহলে শিরক হয় কিভাবে? বরং শরীয়তের জটিল কথাগুলো আমরা নিজেরা ব্যাখা না করে ইমামদের ব্যাখ্যা মানি। কারণ তাঁরা আগের যুগের লোক ছিলেন স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) প্রায় ১০ জন সাহাবীর সংশ্রব পেয়েছিলেন। শরীয়তের জটিল কথাগুলো বা এই বিষয়গুলো তাঁরা সমাধান করে দিয়ে গেছেন।

যেকোনো বিষয়ে আমরা তাঁদেরকে ইমাম মানি না। যেমন– নামায পাঁচ ওয়াক্ত। রমাজানের রোজা ৩০টি। এ ক্ষেত্রে ইমাম মানার প্রয়োজন নেই। ধনী হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। এখানেও ইমাম মানার প্রয়োজন নেই।... বরং কিছু জটিল মাসআলা আছে, যার সমাধান করা আপনার-আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি-আমি সমাধান করতে গেলে এক্সিডেন্ট করব। শুধু এ ধরনের মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে মাযহাবের ইমামদের অনুসরণ করা হয়।

এই মাযহাব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার 'মানশা' অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে এবং সারা দুনিয়ার মুসলমানরা আনন্দচিত্তে মিলেমিশে এই চার মাযহাব অনুসরণ করে আসছে। কিন্তু গাইরে মুকাল্লিদদের জন্মলাভের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ শুরু হয়। একই মসজিদে দুটি জামাআত হচ্ছে, যারা আমীন আস্তে বলে তারা আগে জামাআত করে আর যারা জোরে আমীন বলে তারা আরেকটি জামাআত করে। এক গ্রুপ নিচতলায় নামায পড়ে, আরেক গ্রুপ ওপরতলায়..! এগুলো মুসলমানদের কাজ নয়। আমাদের কিছু ভাই বলতে শুরু করেছেন যে "তারা তো আর কাফের নয়, তার পরও আমাদের হুজুররা এদের বিরুদ্ধে কেন সেমিনার ডাকেন?" আমাদের এ লোকগুলো সাদাসিধে মানুষ। এ কারণে তারা বোঝে না যে তাদের সাথে মতবিরোধ শুধু আমীন জোরে বলা আর আস্তে বলা নিয়ে নয়, বারবার হাত উঠানো আর না উঠানো নিয়ে নয়। কেননা এগুলো তো অন্য মাযহাবেও আছে। তাদের সাথে আমাদের মূল দ্বন্দ্ব হলো, 'শরীয়তের যে চার দলিল রয়েছে তথা কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-কিয়াস, যা ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণ হতে পারে না এবং অসংখ্য মাসআলার সমাধান সম্ভব হবে না–এই চার দলিল কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। অথচ তারা ইজমা ও কিয়াস এ দুটিই মানে না বা অস্বীকার করে। ইমামদের ইজমা ও জটিল মাসআলায় তারা যে কিয়াস করেছে এগুলোও তারা অস্বীকার করে।' যেমন– হেরোইন সেবন করা জায়েয কি নাজায়েয তা কোরআন-হাদীসে নেই। এখন আমাদের কাছে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে হেরোইন খাওয়া জায়েয আছে কি না? তখন আমরা দেখব যে মদের ভেতর যে ক্ষতি রয়েছে হুবহু সে ক্ষতি হেরোইনেও রয়েছে তখন আমরা বলব এটা হারাম। অথচ এ কথাটি কোরআন-হাদীসে কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। শুধু মদের ক্ষতির দিকগুলো হেরোইনের মধ্যে পাওয়া যাওয়ার কারণে এই হুকুম প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এটাকেই কিয়াস বলা হয়।

(চলবে ইনশা আল্লাহ)

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপ্টিক্যাল কো.

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারী ও খুচরা দেশী বিদেশী চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা, ১২১৫
ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

বিরল প্রতিভার চিরবিদায়

মুফতি আব্দুল হালিম বোখারী

১৯৬০ সালে আমি পটিয়া মাদরাসায় এসে ভর্তি হলাম। তখন থেকেই ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহ.)-এর সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন তিনি বগুড়া জামিল মাদরাসায় ছিলেন। উল্লেখ্য ১৯৬০ সাল থেকে ৬৮ সাল পর্যন্ত আলজামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কুতবে যামান মুফতী আজীজুল হক (রহ.)-এর নির্দেশে পটিয়া মাদরাসার অধীনে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গে দ্বীনি কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ফহযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) সে সময়কার কঠিন মেহনতের ফসল আজকের বিশাল বগুড়া জামিল মাদরাসাসহ অসংখ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। কয়েক বছর পড়াশোনার পর ১৯৬৪ সালে আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করি। ফারেগ হওয়ার পর পটিয়া মাদরাসায় বাংলা বিভাগে ভর্তি হলাম। আমাদের নিয়েই এ বিভাগের যাত্রা শুরু। সেই সময় পটিয়া মাদরাসার তৎকালীন মহাপরিচালক হাজী ইউনুছ (রহ.) মুফতী সাহেবকে পটিয়ায় নিয়ে আসেন। ফারেগ হয়ে আমি টাঙ্গাইল চলে যাই। সেখান থেকে ১৯৮২ সালে পটিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। সেই সময় হুজুরের সঙ্গে আমার মেলামেশা-ওঠাবসা বেশি হয়েছে। তাতে যা দেখেছি, তিনি ক্ষণজন্মা, বিরল প্রতিভা ছিলেন। ফিকহের কিতাবগুলোতে রয়েছে : ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজ সময় ও সমাজ সম্পর্কে জানে না, সে-ই প্রকৃত মূর্খ।' মুফতী হওয়ার জন্য যুগসচেতনতা খুবই জরুরি বিষয়। হযরত মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (রহ.)-এর স্বাতন্ত্র্য এখানেই। তিনি অত্যন্ত যুগসচেতন মুফতী ছিলেন। একবার এক মাদরাসার মুহতামিম সাহেব হুজুরের কাছে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! আমাদের এক মুহাসসেল (অর্থ সংগ্রহকারী) হজের মৌসুমে সৌদি আরবে গেছেন। তিনি আরাফাহ, মিনা, মুজদালিফাসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে সেগুলোও মাদরাসার খরচ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এখন আমরা কি সেই ব্যয়ভার গ্রহণ করতে বাধ্য? মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই দিতে হবে। কারণ আরাফাহ, মিনা ও মুজদালিফায় বহু লোকের সমাগম ঘটে। অনেকে মনে করে, সেখানে দান করলে সাওয়াব বেশি। উক্ত মুহাসসিল ওই সব এলাকায় মাদরাসার কাজেই গেছেন বলে ধরা যায়। তাই সেখানকার খরচও মাদরাসাকে বহন করতে হবে।'

মুফতী সাহেব হুজুরের (রহ.) মেধাশক্তি খুবই প্রখর ছিল। একবার এক মাদরাসার শিক্ষক এসে সেই মাদরাসার মুহতামিমের বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ওই মাদরাসায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। হুজুর দীর্ঘ সময় তা শুনে পরিশেষে বললেন, 'আপনার কথা দ্বারা বোঝা গেল, মুহতামিম সাহেব আপনার ওপর অবিচার করেছেন। তাহলে এমন জালিমের অধীনে আপনি চাকরি করেন কেন? আমি হলে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যেতাম।' হুজুর ওই মাদরাসায় বিশৃঙ্খলা হতে দেননি। বরং হিকমতের সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে নিরুত্তর করে দেন। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) ফাতওয়া সম্পর্কে খুবই দক্ষ ছিলেন। তিনি সময়ের সঠিক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে পারতেন। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল খুবই তীক্ষ্ম। কওমী মাদরাসার মধ্যে হরকাতুল জিহাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তিনিই সোচ্চার হন। সেই সময় অন্যরা কেউ হরকাতুল জিহাদের চূড়ান্ত পরিণতি বুঝতে পারেননি। পরে সবাই ধীরে ধীরে বিষয়টি উপলব্ধি করতে থাকেন। কওমী মাদরাসা নিয়ে কেউ কেউ আজকাল যে দু-একটি বিরূপ মন্তব্য করার সুযোগ পাচ্ছেন, তা এই হরকতের কারণেই। হযরত ফকীহুল মিল্লাত সাহেব (রহ.) প্রথম এর বিরোধিতা করেছিলেন। ডা. জাকির নায়েক আহলে হাদীসের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁর বিষয়ে মুফতী সাহেব হুজুরই (রহ.) সবার আগে মানুষকে সতর্ক করেছেন। চট্টগ্রামে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন'-এ তিনি এ বিষয়ে আলেম সমাজ ও সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে বলেছেন। অথচ তাঁর বিতর্কিত বক্তব্যগুলো তখনো এতটা প্রচার পায়নি। তখন আলেমদের কেউ কেউ এ বিষয়ে হুজুরের সমালোচনাও করেছেন। কিন্তু এখন তো সবার কাছে জাকির নায়েকের বিষয়টি পরিষ্কার। হযরত ফকীহুল মিল্লাত সাহেব (রহ.) বলার বহু পরে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, দারুল উলূম দেওবন্দ, এমনকি সৌদি আরব থেকেও জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে ফাতওয়া এসেছে। আহলে হাদীসের অপতৎপরতার বিরুদ্ধেও তিনিই প্রথম প্রতিবাদী হন। তখন তাদের কার্যক্রম সীমিত পরিসরে ছিল। এখন তো এটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমরা হুজুর বলার পর থেকেই এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি অব্যাহত রেখেছি। এটা হযরত মুফতী সাহেব হুজুরের দূরদৃষ্টির জ্বলন্ত প্রমাণ।

হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি একজন দক্ষ শায়খুল হাদীস ছিলেন। পটিয়া মাদরাসায়ও তিনি দীর্ঘদিন বুখারী শরীফ পাঠদান

করেছেন। তাঁর দরসের বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি হাদীসের ব্যাখ্যায় বড় বড় মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতি দেওয়ার পর বলতেন, এই হাদীস থেকে বর্তমান যুগের এই মাসআলা সমাধান করা যায়। অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি শরীয়তের বিধিবিধানের প্রয়োগ দেখাতেন। এভাবে তিনি দরস দিতেন। তাঁর মেধা ও স্মরণশক্তি খুবই প্রখর ছিল। এমন মেধাবী মানুষ আমি খুবই কম দেখেছি। কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড 'ইত্তেহাদুল মাদারিস'-এর প্রতিষ্ঠালগ্নে হাজী ইউনুছ সাহেবসহ (রহ.) মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) সারা দেশে ব্যাপক প্রচারণা চালান। তখন হুজুরকে দেখতাম এশার নামাযের পর ওয়াজ করতে বসতেন, ফজরের আগে সেই বসা থেকে উঠতেন। কোনো ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করত না। এটি ১৯৮২ বা ৮৩ সালের কথা। তখনকার কিছু কথা এই কিছুদিন আগে মুফতী সাহেব হুজুরের সামনে ওঠে। আমি দেখলাম, হুজুর সেই ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে বলে যাচ্ছেন।

পরে হযরত ফকীহুল মিল্লাত সাহেব (রহ.) সুলুক ও তাসাউফের দিকে ধাবিত হন। তিনি এই জগতেও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন। খুব অল্প সময়ে হারদূয়ী হযরত হারাম শরীফে তাঁকে খিলাফত দেন। অথচ হারদূয়ী হযরত (রহ.) যাকে-তাকে খিলাফত দেন না, এমনকি মুরিদও বানান না।

হযরত মুফতী সাহেব হুজুর (রহ.) খুবই কর্মতৎপর মানুষ ছিলেন। একবার ইত্তেহাদুল মাদারিসের বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব হয়ে যায়। হুজুর আমাকে নিয়ে এক রাতে বসে প্রায় ৩০টি পরীক্ষা হলের ছাত্রদের রেজাল্ট লিখে ফেললেন। অথচ তাঁকে একটুও ক্লান্ত দেখা যায়নি।

হুজুরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল, অনেক সময় অন্যদের সঙ্গে চিন্তাগত বিরোধ হলেও তিনি আমাদের তা বুঝতে দিতেন না। কিন্তু নিজে নিজে তিনি বিষয়টির মীমাংসার পথ খুঁজতেন। বিরূপ পরিস্থিতি তিনি খুব সহজেই জয় করতে পারতেন। নেতৃত্বের পূর্ণ দক্ষতা ও যোগ্যতা মুফতী সাহেব হুজুরের মধ্যে ছিল। তিনি কখনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেন না। যেকোনো বিষয়ে তাঁর স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত ছিল। সবার অভিমত শোনার পর তিনি বলতেন, 'আমার অভিমত হলো এই।' জাতির যাঁরা অভিভাবক, তাঁরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলে জাতির জন্য সেটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

হযরত মুফতী সাহেব সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কখনোই তাঁর সিদ্ধান্তহীনতা ছিল না। এমনকি তিনি যে বিষয়কে সঠিক জ্ঞান করতেন, শত বাধা-প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি তা করে দেখাতেন। যোগ্য মুরব্বির অন্যতম গুণ হলো, অধীনদের বিষয়ে সতর্ক খবরাখবর রাখা। কেননা অনেক সময় অধীনদের মন্দ কাজকর্মের দায়ভার মুরব্বিদেরই বহন করতে হয়। কোনো কাজ করলে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাশোনা করতেন। এমন করতেন না যে কাউকে কোনো দায়িত্ব দিয়ে তিনি বসে থাকতেন। এভাবে তিনি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণে রাখতেন।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত সাহেবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি সমালোচকদের কখনো আঘাত করতেন না। ভালোবাসা দিয়ে, আদর-আপ্যায়ন দিয়ে তিনি শত্রুদের কাছে টেনে নিতেন। যারা হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)কে অপছন্দ করত, তারাও কখনো হুজুরের কাছে এলে তিনি এমনভাবে আপ্যায়ন করতেন যে একসময় ওই ব্যক্তিও হুজুরের ভক্ত হয়ে যেত। ঈমানের সঙ্গে আমলের, তালিমের সঙ্গে তারবিয়াতের এক অসাধারণ সমন্বয় করেছিলেন তিনি। তাই তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাদরাসাগুলোতে আমলের ওপর খুবই জোর দেওয়া হয়। তিনি মানুষকে নজিরবিহীন মেহমানদারি করতেন। আমার দেখা আর কোনো মাদরাসায় এভাবে উত্তমরূপে মেহমানদারির ব্যবস্থা নেই। প্রত্যেক মেহমানের স্তর ও মান অনুযায়ী অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে তিনি মানুষকে আপ্যায়ন করতেন। বাংলা ভাষায় মানুষ যাতে সহজে সমকালীন মাসআলা-মাসায়েল জানতে পারে, সে জন্য তিনি মাসিক 'আল-আবরার' নামে একটি পত্রিকা বের করেছেন। অন্য সব মাসিক পত্রিকার তুলনায় আমার বিবেচনায় এটা খুবই সমৃদ্ধ। এর পাঠকসংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে।

তিনি তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায়ও খুবই পারদর্শী ছিলেন। একদিকে হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে ইলমে মানতেকে পারদর্শী লোকের সংখ্যা সত্যিই বিরল।

তিনি মাতৃভাষায় পাঠদানের পক্ষপাতী ছিলেন, তবে জ্ঞানের আরো বহু জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তিনি ফার্সি ও উর্দু ভাষা শেখা-শেখানোর প্রতিও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার অন্যতম রূপকার তিনি। লেনদেন পরিচ্ছন্ন না হলে ধর্মের ওপর টিকে থাকা কঠিন। এই মর্ম অনুধাবনে হযরত মুফতী সাহেবই প্রথমে এগিয়ে আসেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থনীতি শিক্ষার ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান "সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিকস বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা করা হয়।

লেখক : মহাপরিচালক
আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

দেশ ও জাতির সেবায়
ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর অবিস্মরণীয় অবদান

মুফতী মুহাম্মদ কিফায়তুল্লাহ শফিক

মানব। দ্যুলোকে-ভূর্লোকে মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকূলের এক শৈল্পিক নৈপুণ্যময় অনন্য সৃষ্টি। সৃষ্টির সেরা রহস্যঘেরা সেই মানবকে ঠেলে দেয়নি কণ্টকযুক্ত অজানা-অচেনা পিচ্ছিল পথে। ছেড়ে দেয়নি পাহাড়সম উচ্ছল উর্মিমালাবহুল উত্তপ্ত-উত্তাল অকূল মহার্ণবের নাবিকহীন নৌযাত্রীর মতো। পাঠিয়েছেন লাখো ক্রোড়ো পথপ্রদর্শক। নবী-রাসূল। সৃষ্টিই ক্ষয়। সৃষ্টিই বিনাশ। প্রাকৃতির অমোঘ সত্য সিলেবাস। একের বিয়োগ অপরের যোগ–এ-ই হচেছ প্রকৃতির ধারা। সব কিছু পরিবর্তনশীল। ক্ষয়যোগ্য। শুধু আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে আলাদা শান। বৈশিষ্ট্য। তিনিই একমাত্র চিরঞ্জীব। চিরস্থায়ী। তাঁর কোনো গুণাবলিও হয় না স্তিমিত ও স্থগিত। তাই নবী-রাসূলগণের বিয়োগান্তেও বন্ধ হয়ে পড়েনি বান্দার প্রতি তাঁর করুণার ঝর্ণাধারা। প্রবাহিত করে রেখেছেন চিরাচরিত বারিধারা। বন্ধ করে দেয়নি নবী-রাসূলের উত্তরাধিকারী প্রেরণ সিলসিলা। পরম্পরা। সত্য-ন্যায় পথের দিশারী অজস্র পীর-আউলিয়া পাঠিয়ে ধন্য করেছেন এ বসুন্ধরা। যাঁরা ইখলাস, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের শক্তিধর স্তম্ভের ওপর ভর করে আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টিকে কুসুমাস্তীর্ণ পথের পথিক বানাতে অব্যাহত রাখেন নির্ঘুম পথচলা।

এমন ক্ষণজন্মা মহা মনীষীদের হতে অন্যতম হলেন অসাধারণ বহুবিধ গুণের অধিকারী বিরল প্রতিভাধর বহুদর্শী ব্যক্তিত্ব প্রবচনতুল্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (রহ.)। যিনি শুধু একজন ব্যক্তি নন, একটি প্রতিষ্ঠান। একটি ইতিহাস। একটি জগৎ। যার প্রতিটি গুণ একটি অধ্যায়। একটি স্বতন্ত্র বিষয়, যা সম্পূর্ণরূপে মুখের ভাষায় বলন, কলমের ডগায় লেখন, হৃদয়ের খাঁচায় আবদ্ধকরণ হবে যথারীতি কষ্টসাধ্য। তার পরও তিনি দেশ ও জাতির সেবায় যে বহুমুখী অবিস্মরণীয় অবদান রেখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, সে সবের মধ্য হতে যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করার প্রয়াসমাত্র।

বাংলাদেশে কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত চর্চায় ব্যাপক উদ্যোগ :

উপমহাদেশে আবহমান কাল হতে চিরপ্রচলিত ধারায় মুসলিম শিশু-কিশোর ও কচি-কাচাদের পবিত্র কোরআন হিফ্য করানোর প্রথাগত প্রচেষ্টা থাকলেও বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত বা পঠন পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। আরবীয় লাহ্নে (সুরে) তেলাওয়াতের রেওয়াজ তো ছিল একেবারে তিরোহিত। তদুপরি স্বচ্ছ, নির্মল পাঠদানের অভাবে আরব-অনারবের ভৌগোলিক দিকগত বিরাট ব্যবধানের প্রভাবে আধিপত্য বিস্তার লাভ করে স্থান দখল করে নেয় ক্বিরাত বিশেষজ্ঞদের অননুমোদিত পথ ও পদ্ধতি। যে বৈচিত্র্যময়তা কোনো একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের জন্য কোনোভাবেই হতে পারে না কাম্য। শোভনীয়। অথচ হাদীস শরীফে এসেছে- رب قارئ للقرآن والقرآن – يلعنه

কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকারী অনেক ব্যক্তি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে অথচ কোরআন তাকে অভিশাপ দেয় (অশুদ্ধ তেলাওয়াতের কারণে)।

এসব কিছু গভীর রেখাপাত করেছিল হযরতের হৃদয়ের অন্দরমহলে। বিস্মিত ও ভাবিয়ে তুলেছিল তাঁর অশান্ত অবুঝ তনু মনকে। ভাব-তন্ময়তার নেই কোনো অন্ত। সুবিস্তৃত চিন্তা-চেতনা ও সুপরিব্যপ্ত কল্পনা-জল্পনার নেই কোনো শেষ। কিইবা হতে পারে এ দৈন্যদশা থেকে উত্তরণের পথ ও পন্থা। খোলাসা ও সুরাহা। কিভাবেই বা করা যায় এক ও অভিন্ন কোরআন তেলাওয়াত প্রথা প্রচলন নির্জনে-কোলাহলে সর্বত্র একই ধ্যান-ধারণায় বিভোর। নিমগ্ন। কওম ও মিল্লাতের উদীয়মান এ প্রভাকর! অবশেষে তাঁর অন্তকরণের সুপ্ত ব্যথা ও বহু দিনের লালিত স্বপ্ন শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত হাজী সাহেব হুজুর (রহ.)-কে ব্যক্তকরণে হলেন উদ্যত। বাস্তবে হলোও তা-ই। আজ যারপরনাই পুলকিত। অতিশয় আহ্লাদিত। হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের বন্ধন। চিন্তার সাথে চিন্তার মিলন। দুজনেরই একই মত। একই অভিমত।

এত দিনের পুঞ্জীভূত ব্যথা ও সঞ্চিত বেদনার বদ্ধ দ্বার উন্মোচিত করেই যেন ঢুকে পড়ল এক প্রমোদোদ্যানে। আজ সব কিছুতেই ভাগাভাগি। শেয়ার। নবোদ্দ্যমে নব সাজে এবার ক্লান্তিহীন অবারিত পথ চলার দৃঢ় সংকল্প। দৃপ্ত শপথ। উভয়ের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে বিশেষত হাজী সাহেব হুজুরের (রহ.) সুনিপুণ তত্ত্বাবধান ও নিবিড় পর্যবেক্ষণে

প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭৬ সালে 'বাংলাদেশ তাহফিজুল কুরআন সংস্থা'। সুতীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর ধীশক্তি ও অপূর্ব চিন্তার আলোকে প্রণয়ন করেন সুদূরপ্রসারী সর্বগ্রাহ্য অব্যর্থ ফলপ্রদ সুস্থ-সুন্দর এক নীতিমালা। গঠনতন্ত্র। উদ্দেশ্য–যথার্থ সহীহ-শুদ্ধ পদ্ধতিতে হিফজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ছাত্রদের পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগানোর মহৎ লক্ষ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ হিফজ সমাপ্তকারী ছাত্রদের জন্য সংস্থার অধীনে বার্ষিক কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ব্যবস্থাগ্রহণ। যাতে করে প্রস্ফুটিতব্য একটি পুষ্প আধমরা হয়ে অকালে ঝরে না পড়ে। বিমোহিত বিমুগ্ধ করতে পারে আমাকে। আপনাকে। সবাইকে। পবিত্র কোরআনের সুবিমল স্বাদ আস্বাদন করে হতে পারে ধন্য। সার্থক ও সফলকাম। রাসূলুল্লাহর (সা.) হাদীসের আলোকে পবিত্র কোরআনের অভিশাপ ও বদ দু'আ থেকে যেন পায় পরিত্রাণ ও রেহাই।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণী ও অনন্ত কৃপায় তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসে সেই হৃদয়পোষ্য অভিলাষে অর্জিত হয়েছে শতভাগ সফলতা। নিরঙ্কুশ স্বার্থকতা। সুজলা-সুফলা, সবুজ-শ্যামলা বাংলার প্রতিটি প্রান্তরে আজ তাজবীদ সহকারে সুললিত কণ্ঠে আরবী লাহনে চিত্তাকর্ষী তেলাওয়াতের যে অভিনব অত্যাশ্চার্য দৃশ্যাবলোকিত হচ্ছে, এতে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) এর রয়েছে ব্যাপক অবদান। শুধু তা-ই নয়, নির্দ্বিধায় এ কথা বললে লেশমাত্রও অত্যুক্তি হবে না যে, অধুনা স্বদেশ পরিধি পেরিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে হতে চলছে প্রসারিত। বর্তমানে বিবিধ মুসলিম বিশ্বে অনুষ্ঠিত সকল হিফজ প্রতিযোগিতার অধিকাংশে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকৃত করছেন আমাদের এ বাংলাদেশের হিফজপড়ুয়া ছাত্ররা। এর চেয়ে বড় আর কী হতে পারে গৌরব আর সম্মান? চাওয়া আর পাওয়া? কেবল ব্যক্তি কিংবা একটি গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং গোটা জাতির জন্যই বয়ে আনছে মান-মর্যাদা। খ্যাতি ও যশ।

উল্লেখ্য, তিনি কোরআন শরীফের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত প্রথা-প্রচলনে এতটাই সরব ছিলেন যে পটিয়া মাদরাসা থেকে শুরু করে তার অধীন সকল মাদারিসে বাধ্যতামূলক ও অত্যাবশ্যকীয় পাঠ্য বিষয় হিসেবে করেছেন অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি চালু করেছেন বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স। এ ক্ষেত্রে তিনি মেনে নিতেন না কোনো ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন। একেবারে অনমনীয়। অদমনীয়। অতএব, এ মিশনের প্রধান রূপকার হিসেবে তাঁর অবদান সত্যিই অনির্বচনীয়। অনস্বীকার্য। মহান আল্লাহ তাঁকে যথার্থ দানে করুক পুরস্কৃত। আমীন।

সুন্নাতে নববীর পুনর্জাগরণে হযরতের অগ্রণী ভূমিকা

এ কথা অকপটে বলা যায় যে অনেক বিজ্ঞ আলেম-উলামাসহ সচেতন ধর্মপরায়ণ মুসলমানগণ ফরজ-ওয়াজিবসমূহের প্রতি যত্নশীল হলেও ওজু, নামায, আযান-ইকামত, আহার-বিহার, চাল-চলন, আচার-আচরণ, কথন-বচন, উঠাবসা, চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, যাবতীয় সামাজিক লেনদেন ও কৃষ্টি-কালচার তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) প্রদর্শিত অনুপম আদর্শ ও নবীজির বাতলানো পথাবলম্বনে পরিলক্ষিত হয় না তেমন কোনো তৎপরতা। বরং মনে হয় এ ক্ষেত্রে উদাসীন। বলতে গেলে এ চারণভূমির বিচরণকারী প্রায় শূন্যের কোটায়। এতদস্থলের এমন করুণদশা দৃষ্টে নিজকে সামলাতে পারেননি এ দিগ্বিজয়ী মানবদরদি মহান পুরুষ। ব্যথা বুকে হন্য হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন আধ্যাত্মিক কোনো রাহবার। চিকিৎসক। স্বার্থ? যাঁর পূত সান্নিধ্যার্জনে সুলূক ও তাসাউফের অমিয় সুধা পানে পরিশোধিত হয়ে সুন্নাতে রাসূলের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও জীবন্ত নমুনারূপে নিজকে গড়ে তুলে আদর্শবিচ্যুত উম্মতকে শাশ্বত আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠাকরণ। একটি সমৃদ্ধ উন্নত জাতি ও একটি সুশীল সমাজ বিনির্মাণ। ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিতকরণ। কথায় বলে, 'যে যা চাই তা পাই' হযরতের একনিষ্ঠ ত্যাগ ও আত্মত্যাগ, বলিষ্ঠ ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা, প্রবল সাধনা ও মুজাহাদা দ্বারা আশাতীত সাফল্যও হয় তাঁর করতলগত।

অবশেষে হাকীমুল উম্মতের সর্বশেষ খলিফা, আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি মুহিউস্‌সুন্নাহ আল্লামা শাহ আবরারুল হক সাহেব হারদূয়ী হযরতের (রহ.) মুবারক হস্তে সোপর্দ করেন নিজকে। আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও পরিপক্বতার্জনে নিবদ্ধ করেন সবিশেষ মনোযোগ। ১৯৯০ সালে পবিত্র মদিনা শরীফে কোনো এক শুভক্ষণে রওজা শরীফ সম্মুখে তাসাউফ ও সুলূকের অনুমতি প্রাপ্ত হন স্বীয় মুর্শিদ হতে। আদিষ্ট হন আদর্শহারা, অসহায় মানব কাফেলার মুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে। এতে করে স্বীয় মুর্শিদের দিকনির্দেশনা ও দু'আয় মনোনিবেশ করেন এ সুমহান কাজে। গুরু দায়িত্বে। চষে বেড়াতে শুরু করেন প্রতিটি জেলায়, থানায়, মাদরাসা-মক্তবে। সকলের কর্ণকুহুরে পৌঁছে দিতে লাগলেন এহয়ায়ে সুন্নাত তথা সুন্নাতের পুনর্জাগরণের ডাক। আওয়াজ। শুধু তাতেই ক্ষান্ত হননি। আরম্ভ করেন থানা ও জেলাভিত্তিক বাস্তব অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়ামসহ বাস্তবমুখী নানা কর্মশালা। স্থায়ীভাবে গড়ে তোলেন নিয়মিত ষান্মাসিক সুন্নাতে নববীর

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। অন্যদিকে আলেম-উলামাদের তাসাউফ ও সুলূকের দীক্ষায় দীক্ষিত করতে স্থাপন করেন বছরব্যাপী একটি খানাকাহও।

তাঁর এ কর্মচঞ্চলতা ও উদ্যমের ফলে আলহামদুলিল্লাহ! মুসলিম জাতির কর্ণধার দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী আলেম-উলামাসহ সকল স্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আপন আপন জীবনে সূচিত হয় সুন্নাত প্রয়োগের এক বিপ্লব। আলোড়ন। শিশু-কিশোর, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের জন্য উন্মোচিত হয় নব এক দিগন্ত। হৃদয়ের পুরনো রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হতে শুরু করল লাখো ওয়ারিশে আম্বিয়ার। নায়েবে রাসূলের। বিদূরিত হতে লাগল অন্তরের জমাটবাঁধা যত সব মরীচিকা। সকলে যেন পেয়ে গেল এক নতুন জীবনের সন্ধান। খোঁজ। তিনিই সেই সৌভাগ্যবান প্রথম ব্যক্তি, যিনি অধমের মতো লাখো মানুষের নিভুপ্রায় ঈমানী তুষানলে ফুৎকার দিয়ে করেছেন প্রজ্জ্বলিত। প্রদীপ্ত। জুগিয়েছেন রাসূলের মহিমান্বিত আদর্শে জীবন গড়ার অনুপ্রেরণা। উদ্দীপনা। আল্লাহপাকই ভালো জানেন কতজনের অন্তর্চক্ষু তিনি খুলে দিয়েছিলেন এভাবে। নতুন প্রাণ সঞ্চালন করেছিলেন কতজনের মুর্দা দিলে। যখনই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কোনো সুন্নাতের বিষয় সামনে আসে তখনই বারেবারে নির্বিঘ্নে মনে পড়ে তাঁর কথা। তাঁর স্মৃতি। অনায়াসে বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে, ওগো রহমান! ওগো রহিম! তিনি যেমন দু-তিন নয় সহস্র মানুষকে ঘোর তমসাচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে এনেছেন আলোর পথে। তুমিও তাঁর কবরকে উদ্ভাসিত করো তোমার নূরের আলোকচ্ছটা দিয়ে। আমীন।

মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণে হযরতের অনন্য ভূমিকা

মুসলিম মিল্লাতের সামগ্রিক অগ্রগতি প্রগতি বিশেষত দ্বীনি উন্নয়নের প্রতি ছিল সদাসময় তাঁর সজাগ ও চৌকস দৃষ্টি। নানাবিধ দ্বীনি সমস্যা ও জটিলতার অবসানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক দুর্দান্ত শক্তি। অজেয় বীর। অমুসলিমদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মোকাবিলা করতেন বুদ্ধিবৃত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ মার্জিত পদ্ধতিতে। পরিশীলিত নিয়মনীতিতে। মুসলমানদের ঈমান-আক্বিদা সংরক্ষণের তাগিদে গ্রামে-গঞ্জে দুর্গম এলাকায় প্রয়োজনভেদে স্থাপন করেছেন বহুসংখ্যক মসজিদ-মাদরাসা-মক্তব। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত এমন কোনো অঞ্চল পাওয়া দুষ্কর হবে, যেখানে লাগেনি তাঁর দ্বীনি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ছোঁয়া। লাগেনি স্নিগ্ধ কোমল হাতের পরশ। এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়টি প্রতিষ্ঠানের আলোচনা না করলে হবে না সমীচীন। যথাক্রমে–

চট্টগ্রাম পটিয়া মাদরাসার নয়নাভিরাম শিক্ষা ভবন, তিন তলাবিশিষ্ট অত্যাধুনিক জামে মসজিদ, হিফজ খানা ভবন (যা তিনি তৎকালীন মহাপরিচালক কুতুবুল আলম হযরত হাজী সাহেব হুজুরের সুনিপুণ তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন)। ঢাকা মহানগরের ঐতিহ্যবাহী অভিজাত এলাকা বসুন্ধরায় প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বতন্ত্র একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান 'মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বসুন্ধরা'। একই স্থানে আকর্ষণীয় ও মনোলোভা অবয়বে পাঁচ তলাবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ছয় তলাবিশিষ্ট হাদীস ভবন ও সাত তলাবিশিষ্ট কসরে আবরার (নির্মাণাধীন)। বসুন্ধরা রিভারভিউতে জামিয়াতুল আবরার নামক উল্লেখযোগ্য আরেকটি স্বতন্ত্র দ্বীনি মাদরাসা ও ঐতিহ্যবাহী জামে মসজিদ। গাজীপুরের জামিয়া আশরাফিয়া ও তৎসংলগ্ন জামে মসজিদ।

'সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিকস বাংলাদেশ বসুন্ধরা' (যা বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতির জগতে একমাত্র সংযোজন) ও বসুন্ধরা মদিনাতুল উলূম মাদরাসা। বগুড়া জামিল মাদরাসার নবনির্মিত শিক্ষা ভবন ও তথায় সদ্যনির্মিত মাদরাসা বোর্ডের কেন্দ্রীয় সদর দফতর ভবন। চট্টগ্রাম শুলকবহর জামিয়া মাদানিয়ার অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যময় নান্দনিক জামে মসজিদসহ সারা দেশ ব্যাপী নির্মিত শত শত মসজিদ-মাদরাসা।

তবে তাঁর সদা সময় বলা একটি বাণী বারবার আমার হৃদয় ভেদ করে, 'বর্তমানে মসজিদ প্রতিষ্ঠার চেয়ে দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা বেশি উত্তম।' আয় আল্লাহ! তোমার শাহী দরবারে বিনীত আর্জি, যে বান্দা তোমার রাসূলের (সা.) নিম্নোক্ত পুণ্যময় বাণীর ওপর উজ্জীবিত হয়ে করেছেন এত সব কিছু। আপনি তা সদকায়ে জারিয়ায় রূপান্তরিত করুন আপন মহিমায়। রাসূল (সা.) বলেছেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ (سنن ابن ماجة ٢٤٢)

নিশ্চয়ই মুমিন বন্দা-বান্দীর মৃত্যুর পরেও নিম্নোক্ত সাতটি আমলের সাওয়াব পৌঁছতে থাকে নিয়মিত।

১. দ্বীনি শিক্ষা, যা সে অর্জন করেছে অতঃপর যেকোনোভাবে তা প্রচার-প্রসারও করেছে।

২. নেককার সন্তান, যাকে তিনি রেখে গেছেন।

৩. কোরআন শরীফসহ দ্বীনি কিতাবসমূহ, যা তিনি পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছেন।

৪. মসজিদ ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, যা তিনি নির্মাণ করেছেন।

৫. মুসাফিরখানা, যা তিনি মুসাফিরদের

জন্য নির্মাণ করেছেন।
৬. পানির নহর, যা তিনি চালু করেছেন।
৭. আর্থিক অনুদান, যা তিনি সুস্থাবস্থায় নিজ হায়াতে স্বীয় মাল থেকে বের করেছেন।

আর্তমানবতার সেবায় হযরতের অনুকরণীয় অবদান

বলাবাহুল্য যে কর্মবহুল বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী মানবহিতৈষী এ মহান ব্যক্তি স্ব উদ্যোগে নিবেদিত ও সমর্পিত চিত্তে ব্যক্তিগত প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে আঞ্জাম দিতে থাকেন বহুমুখী সেবাকর্ম। পরিচালিত ও বাস্তবায়িত করতে থাকেন বহুবিধ প্রকল্প। একের পর এক। বিরামহীন গতিতে। অবশ্য পরবর্তীতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের, বিশেষত ধর্মভীরু দানবীর আমজনতার জন্য উন্মুক্ত অংশগ্রহণের অগাধ সুযোগ রেখে পরবর্তীতে একটি স্বকীয় সংগঠনে রূপদানের প্রবল ইচ্ছার উদ্রেক হতে থাকে তাঁর মনে। তাই হাড়ভাঙা মেহনত ও ঘামঝরা খাটুনি করে গঠন করেছিলেন 'ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'। লক্ষ্য–পীড়িত, দরিদ্র, রিক্তহস্ত, অসহায়, বিধবা, এতিম, দুস্থ, অনাথ ও সম্বলহীনদের অর্থসেবাসহ সার্বিক সহায়তা সুনিশ্চিতকরণ। বিশেষত ধর্মীয় সেবাবঞ্চিত মানুষের সেবা নিশ্চিতকরণ। কোনো মোহ-প্রমোহ পার্থিব লোভ-লালসা কখনো আচ্ছন্ন করতে পারেনি তাঁকে। সম্পূর্ণ নির্লোভ। নিঃস্বার্থ। নিতান্ত আমানতদারি, নিদারুণ স্বচ্ছতা ও নিখাদ সততার সাথে বিত্তশালীদের স্বেচ্ছা প্রদত্ত নগদ অনুদান বণ্টন ও বিলি করে যেতেন যথাযথ উপযুক্ত খাতে। মূলত হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) রাসূলের এমন উৎসাহব্যঞ্জক বাণীর ওপর পরিপূর্ণ আস্থাপূর্বক উৎসাহিত হয়ে যেকোনো সেবাকর্মে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন ধন-দৌলত, অর্থ-সম্পদ, শ্রম ও মেহনত। সর্বস্ব। দৌড়ে-ঝাপে এগিয়ে যেতেন পীড়িত মানবের দুর্দিনে। হাদীসে এসেছে–

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر أخاه المؤمن فى الدنيا ستره الله فى الآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه) سنن النسائى)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুনিয়ার কোনো দুঃখ-দুর্দশা দূর করবে মহান আল্লাহ তাকে আখিরাতের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ভাইয়ের দুনিয়াতে কোনো দোষ-ত্রুটি চেপে রাখে মহান আল্লাহ আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি চেপে রাখবেন। আর বান্দা যতক্ষণ স্বীয় ভাইয়ের (ঈমানী ভাই) সাহায্য-সহায়তা করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তার সাহায্য-সহায়তা করতে থাকেন।' (নাছাঈ শরীফ)

কিংবদন্তিতুল্য এ মহাপুরুষ! দেশ ও জাতির যে বহুমুখী খেদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন তার কিঞ্চিৎকর নমুনা পেশ করছি।

(ক) উপকূলীয় অঞ্চলে :

১৯৯১ সাল। ২৯ এপ্রিল। ইতিহাসের ভয়াল এক রাত। বাঁশখালী, মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও চকরিয়া উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে প্রবল বেগে ধেয়ে এসেছিল মহাপ্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। সব কিছু হয়ে গিয়েছিল লণ্ডভণ্ড। কেড়ে নিয়েছিল অসংখ্য-অগণিত বনী আদমের প্রাণ। যেদিকে নজর যায় শুধু লাশ আর লাশ। যেন এক মৃত্যুপুরী। এ দুর্গত মানবতার খেদমতে তাৎক্ষণিক এগিয়ে এসেছিলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় শায়খ ফকীহুল মিল্লাত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)। বিপুল পরিমাণে খাদ্য রসদ, ওষুধ পথ্য, জরুরি আসবাবপত্রসহ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিধ্বস্ত এলাকায় কয়েকটি টিম। তারা নিরন্নদের অন্ন, বিবস্ত্রদের বস্ত্র, রুগণ্দের চিকিৎসা ও গৃহহীনদের আশ্রয়দানসহ বিভিন্ন সেবাকার্য হুজুরের তত্ত্বাবধানে সফল ও স্বার্থকভাবে আঞ্জাম দিয়ে দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালে কঠিন বিপদ মুহূর্তে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে স্থাপন করেছেন বিরল দৃষ্টান্ত।

উল্লেখ্য, মুসলিম মিল্লাতের কাণ্ডারি মাথার মুকুট আলেম-উলামা যাদের শান-ই হয়ে থাকে এ রকম যে তারা মাদরাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ালেও নিজের বেলায় সম্পূর্ণ বিপরীত।

কোরআন-হাদীসের সম্মানার্থে ত্রাণ গ্রহণের জন্য ভিনদেশি কোনো এনজিওর শরণাপন্ন কিংবা স্থানীয় ত্রাণ বিতরণকারী সরকারি কোনো সংস্থার নিকট ধর্ণা দেওয়া হতে থাকেন সমপূর্ণরূপে বিরত। কোনোক্রমেই আমজনতার কাতারে দাঁড়াতে হন না রাজি ও সম্মত। আবার এদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাবলম্বী ভেবে স্ব উদ্যোগে কেউ ন্যূনতম সাহায্য করতেও আসেন না এগিয়ে। পবিত্র কোরআন শরীফে আলেম সমাজের এহেন সহানুভূতি শূন্যাবস্থার বর্ণনা দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٧٣)

'খয়রাত ওই সব লোকের জন্য, যারা আল্লাহর পথে হয়ে গেছে আবদ্ধ, সক্ষম নয় জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে। অজ্ঞ লোকেরা ভিক্ষা না চাওয়ার কারণে তাদেরকে মনে করে অভাবমুক্ত। তোমরা তাদেরকে চিনবে

লক্ষণ দ্বারা। তারা ভিক্ষা চায় না মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।'(সূরা বাকারাহ্, ২৭৩)।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (রহ.) এ সকল বাস্তবাবস্থাদি অনুভব করেন অন্তরে অন্তরে। মরহুম মাওলানা জহিরুদ্দীন কুতুবী, মাওলানা ওবায়দুল হক ঈদগাহী ও মরহুম মাওলানা এবাদুল্লাহ রামুভীর নেতৃত্বে গঠন করেন একটি বিশেষ টিম। যাঁরা বিপদগ্রস্ত অসহায় আলেম-উলামাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে স্বহস্তে তুলে দেন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আর্থিক অনুদান ও সহায়তা। সত্যিই হযরতের এমন মহৎ উদ্যোগ ভাবী প্রজন্মের জন্য অবিস্মরণীয় একটি দৃষ্টান্ত বললেও হবে না অতিরঞ্জিত। অতিশয়োক্তি। আয় আল্লাহ! তিনি যেমন তোমার বান্দার বিপদাপদে এসেছিলেন এগিয়ে, তুমিও তাঁর বিপদের সময় তোমার রহমতকে দাও এগিয়ে। আমীন।

(খ) বার্মিজ শরণার্থী শিবিরে :

১৯৯১সাল। বার্মার তৎকালীন সামরিক জান্তা মেতে উঠেছিল মুসলিম নিধনে। এ রক্তপিপাসু হায়েনারা উন্মাদ ও উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল রক্তের নেশায়। পুরোদমে চলছিল মানুষ মারার মহোৎসব। কাউকে জীবন্ত পুড়িয়ে আবার কাউকে মাটিতে জীবন্ত প্রোথিত করে। নির্মম বর্বরতা ও পাশবিকতার নিষ্ঠুর শিকার অসহায় মুসলিম নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দ্বীন-ঈমান বাঁচানোর তাগিদে অনুপ্রবেশ করতে লাগল পাশের উখিয়া-টেকনাফের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। কেউবা ধৃত হয়ে আবার কেউ বা স্বেচ্ছায়। সে বেদনাবিদূর মুহূর্তে অকথ্য জোর-জুলুম ও নির্যাতনের জাঁতাকলে পিষ্ট, নিগৃহীত, মজলুম মানবতার জন্য তৎকালীন সরকার অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সুব্যবস্থা করলেও প্রয়োজনবোধ করেনি মহান আল্লাহর অতীব গুরুত্বপূর্ণ ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য কোনো মসজিদ-ইবাদতখানা নির্মাণের। অথচ মুসলিম মাত্রই সামাজিক জীবনযাপনের জন্য এটা এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও বটে।

ঠিক সে মুহূর্তেই অতি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণ আল্লাহর ওলী হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) দৃঢ়চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন সে আশ্রিত রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের মহৎ উদ্যোগ। আমার স্মৃতি অ্যালবামে এখনো ধারণ করা আছে, হযরতের একান্ত আস্থাভাজন মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবের নেতৃত্বে আমরা সশরীরে উপস্থিত থেকে নির্মাণ করেছিলাম গাছ-বাঁশের কাঁচা মসজিদ, যেগুলো পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয়েছে পাকা মসজিদে। যাতে করে উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাসকারী মুসলমানরা দ্বীনের ওপর অবিচল থেকে করতে পারে ঈমান-আক্বিদার হেফাজত ও সংরক্ষণ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হৃদয় জগতে লাগাতে পারে ঈমানী ফলদ বৃক্ষ। উর্বর জমি পরিচর্যাহীনতায় পরিণতি না পায় পতিত ভূমিতে। তিক্ত সত্য যে বর্তমান ক্যাম্পের অভ্যন্তরে যে সকল মসজিদে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা এবং দাওয়াতে তাবলীগের কর্মক্রিয়া চলছে সবই তার শাণিত চিন্তা-ফিকিরেরই ফল ও ফসল।

(গ) দুর্গত মানুষের পাশে :

১৯৯৪ সাল। এখনো আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য।

টেকনাফ-কক্সবাজারের সর্বসাধারণ পুরনো ক্ষত সেরে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই পুনরায় আঘাত হানে তাদের ওপর ভয়াবহ প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড়। যার জোরালো আক্রমণে জনজীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। নেমে আসে বিপর্যয়। আগেরকার মতো দুর্গত মানবতার দুর্ভোগ কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পথ সুগম করতে আক্রান্ত এলাকায় ছুটে আসে বিভিন্ন ত্রাণকর্মী ও আর্থিক সাহায্যকারী সংগঠন। কিন্তু পূর্বের ন্যায় এবারও দেশ ও জাতির অতীব প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত মসজিদ-মাদরাসা ও ইসলামের ধারক-বাহক অসহায় আলেম-উলামারা ছিল বঞ্চিত। মাহরুম। এদের প্রতি ছিল না কারো কোনো দৃষ্টিপাত। ঠিক সে সময়েই সর্বাগ্রে ছুটে আসেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)। সর্বস্তরের ক্ষতিগ্রস্ত আলেম-উলামাকে একত্রিত করেছিলেন টেকনাফ সদরের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি মাদরাসা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া মিলনায়তনে। কুশল বিনিময় করেন সবার সাথে। সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ তা'আলার ওপর পূর্ণ ভরসা স্থাপন ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণের ওপর একটি চিত্তাকর্ষী বক্তব্য রেখে উপস্থিত প্রত্যেকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তিন হাজার টাকা করে নগদ অনুদান। মহান আল্লাহর শাহী দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ জানাই, মহান আল্লাহ যেন তাঁকেও সিক্ত করেন উত্তম প্রতিদানে। আমীন।

(ঘ) সিডর আক্রান্ত এলাকায় :

২০০৭ সাল। বরিশাল, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, ভোলাসহ পুরো দক্ষিণাঞ্চল ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় 'সিডরের' আক্রমণে হয়ে গিয়েছিল তছনছ। ওলটপালট। জনজীবন হয়ে উঠেছিল বিপর্যস্ত। বিধ্বস্ত। তখন তিনি দলমত-নির্বিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সর্বস্তরের মানুষের জন্য প্রায় অর্ধ কোটি টাকারও বেশি নগদ অনুদানসহ প্রেরণ করেছিলেন বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের শিক্ষক মহোদয়গণের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল। তাঁরা প্রদত্ত অনুদান নিখুঁতভাবে তুলে দিলেন মানুষের হাতে। সমব্যথা ও সমবেদনার সুরে তিনিও শরিক হয়েছিলেন দুর্দশাগ্রস্তদের

কাতারে। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা জাতিকে তাঁর নেমুল বদল দান করুক। আমীন।

(ঙ) টর্নেডোকবলিত অঞ্চলে :

২০১৩ সাল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশাল একটি অঞ্চল টর্নেডোর আঘাতে হয়ে গিয়েছিল ক্ষত-বিক্ষত। সর্বগ্রাসীর করালগ্রাসে সব কিছুই নষ্ট। বিনষ্ট। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল দুর্যোগ। দুর্ভোগ। অর্ধাহারে-অনাহারে মানুষ মরছিল ধুঁকে ধুঁকে। চলছিল জীবন-মরণের সংগ্রাম। লড়াই। তখনো দুর্যোগকবলিতদের পাশে দাঁড়াতে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন আমাদেরই পরম প্রিয় সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্বর্ণালি যুগের দীপ্তিমান উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)। সেখানকার স্থানীয় এক মাওলানা জনাব আলী আজম সাহেবের নেতৃত্বে দুর্যোগ কবলিত এলাকায় হিন্দু মুসলিম নির্বেশেষে অর্ধশতাধিক পরিবারকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঘর নির্মাণ করে দিয়ে ঈর্ষণীয় অবদান রেখেছিলেন আর্তমানবতার সেবায়। মহান প্রভুর দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই, আয় আল্লাহ! যিনি জীবনের প্রতিটি অণু-পরমাণু তোমার সৃষ্টিকূলের সেবায় করেছিলেন উৎসর্গ। তুমিও তাঁকে কোনো নেক আমলের উসিলায় জান্নাতের সুউচ্চ আসনে করো সমাসীন। আমীন।

(চ) গরিব-দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে ঈদবস্ত্র বিতরণ :

হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم -قَالَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْىٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ .) سنن أبى داود)

'কোনো মুসলমানকে দুনিয়ার পোশাক পরিধান করালে মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করাবেন।' অন্য আরেক হাদীসে এসেছে– 'মুসলমানের শরীরে যতক্ষণ আপনার দেওয়া পোশাক বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মহান আল্লাহ তা'আলার সার্বিক নিরাপত্তার চাদরে আবৃত থাকবেন।' রাসূলুল্লাহর (সা.) উপরিউক্ত পুণ্যময় বাণীদ্বয়ের মর্মবাণীতে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে প্রায়শ ঈদ ও শীত মৌসুমে অসংখ্য গরিব, দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে উদারহস্তে প্রচুর পরিমাণে পরিধেয় কাপড়চোপড়, কম্বলসহ প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্রের বিতরণ ছিল লক্ষ করার মতো। ওগো মহামহিম পরওয়ারদিগার! তোমার নবীর পূতঃ পবিত্র কণ্ঠে ঘোষিত সুসংবাদ মতে তাঁকে শুধু শুধু তোমারই কৃপাগুণে করে রেখো জান্নাতী পোশাকে আচ্ছাদিত। আবৃত। আমীন।

(ছ) মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে :

২০১৪ সাল। ৭, ৮ ও ৯ নভেম্বর কক্সবাজার জেলা শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিন দিনব্যাপী জেলা তাবলীগী ইজতেমা। বিশাল জমায়েত। কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। অসহনীয় তাপদাহ। প্রথমবারের মতো হওয়ায় ব্যবস্থাপনা ছিল অপর্যাপ্ত। সব কিছুর প্রকট সংকট। আগত মুসল্লিদের পানির অপ্রতুলতা ও অসহনীয় তাপদাহ নিবারণে ফ্যান স্বল্পতার সংবাদ শুনে হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) হয়ে পড়েছিলেন ব্যাকুল। চিন্তিত। সঙ্গে সঙ্গে স্ব উদ্যোগে নিজ ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সরবরাহ ও ফ্যান ব্যবস্থাকরণের নির্দেশদানপূর্বক দায়িত্ব প্রদান করেন মরহুম মাওলানা এবাদুল্লাহ সাহেবকে। সাথে এ মর্মেও সতর্ক থাকতে বলেন, আমাদের অবহেলার কারণে ইজতিমায় আগত নবীজির (সা.) কোনো মেহমানের যেন না হয় বিন্দুমাত্র কষ্ট। ভোগান্তি। মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর হিমশীতল ছায়াতলে আশ্রয়দান করুন। আমীন।

এতিম প্রতিপালন ও সহায়তা প্রকল্প :

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে–

عن سهل بن سعد :عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا . وقال بإصبعيه السبابة والوسطى (صحيح البخارى)

'হযরত সাহল ইবনে সা'আদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি এবং এতিমদের তত্ত্বাবধায়নকারী বেহেশতে এরূপ (নিকটবর্তী) থাকব। রাসূল (সা.) শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল দ্বারা ইশারা করিয়ে (দুজনের) নিকটবর্তী অবস্থা দেখালেন। '(বুখারী শরীফ)।

উল্লিখিত হাদীসের মর্মবাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বীয় হায়াতে করেছিলেন এর অবিকল বাস্তব রূপায়ণের অনুশীলন। সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন দ্বীনি মাদরাসায় অধ্যয়নরত এতিম ছাত্রদের খোরপোষ ও চিকিৎসাসেবার ব্যয় নির্বাহ নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত করতে চালু করেছিলেন জনপ্রতি মাসিক ভাতা। হযরতের পক্ষ হতে উক্ত প্রকল্পের হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল আমি অধমের ওপর। আমার হিসাব মতে, এ প্রকল্প হতেই যথারীতি ব্যবস্থা করা হতো প্রায় ১২০টি দ্বীনি মাদরাসার অধীনে ১২০০ এতিম ছাত্রদের ভরণ-পোষণের সমূহ ব্যয়। যা এক নজিরবিহীন ইতিহাস। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সম্পর্কে দুই-তিন হাজার পরিবারকে মাসিক ভাতা প্রদান করার জনশ্রুতি রয়েছে। হাল যামানায় এগুণটি ব্যাপক হারে প্রত্যক্ষ করা গেল হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) এর মাঝে।

মহান আল্লাহ তাঁকে স্বীয় নবী প্রদত্ত সুসংবাদ মতে সত্যি সত্যিই জান্নাতে নবীজির সান্নিধ্যার্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংকিং ধারা প্রবর্তনে হযরতের অতুলনীয় অবদান :

হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ قَالَ وَقَالَ مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ) مسند أحمد)

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সাক্ষী এবং সুদের দলিলপত্র লেখকের ওপর অভিসম্পাত দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, যে সম্প্রদায়ে সুদ ও ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে গেছে সে সম্প্রদায় নিজেদের ওপর আল্লাহর আজাব-গজব বৈধ করে নিয়েছে।' (আল্লাহর গজব অবধারিত হয়ে যায়)।

সুদ মহাপাপ। ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। সুদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।' (আল বাকারাহ্-২৭৮, ২৭৯)

এ অভিশপ্ত ঘৃণ্য সুদ হতে সমাজকে পরিত্রাণের জন্য ১৯৮৩ সালে ইসলামী মনোভাবসম্পন্ন কতেক সুধীমহলের মনে জেগে ওঠে এক নতুন চেতনা। গ্রহণ করেন সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংকিং ধারা প্রবর্তনের সমন্বিত উদ্যোগ। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে শুরু হয় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সুদবিহীন ব্যাংকিং ধারার যাত্রা। এ মহান ব্রতে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বপ্রথম শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.'। আর এতেই 'শরীয়াহ বোর্ডের অন্যতম সদস্য হিসেবে মনোনীত হন হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)। সূচনালগ্ন থেকে মুসলিম জাতিকে অভিশপ্ত সুদের ছোবল হতে বাঁচানোর জন্য তিনি যে অভূতপূর্ব প্রস্তাবনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী পেশ করেছিলেন বর্তমান সময়ের ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য তা অনুকরণীয়-অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। সর্বমহলে সমাদৃত। স্বীয় মেধা ও প্রজ্ঞা গুণে সর্ব বিষয়ে নিত্যনতুন আবির্ভূত সমস্যাবলির অনায়াসে প্রামাণিক সমাধানদানে দক্ষ ও পারদর্শী হওয়ায় দেশ-বিদেশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যশ ও খ্যাতি। নাম ও ডাক।

তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় বিমুগ্ধ হয়ে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, শাহ্ জালাল ইসলামী ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া ইসলামী শাখা ও বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকসমূহের 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ কাউন্সিল' তাঁকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। মৃত্যুবদি তিনি সে দায়িত্ব পালন করে যান। মহান আল্লাহ প্রদত্ত এ বিরল যোগ্যতা ও অসাধারণ প্রতিভার তরী যেন ভেসে না যায় আচমকা ঝড়ের উত্তাল তরঙ্গে। হারিয়ে না যায় বিস্মৃতির তীরে। বেঁচে থাকে জীবন্ত প্রতীক হয়ে যুগ যুগ ধরে। বঞ্চিত না হয়ে পড়ে নতুন প্রজন্ম। প্রজ্জ্বলিত থাকে তাঁর অনুপম আদর্শ। সে লক্ষ্যে মাইলফলকস্বরূপ চালু করে গেছেন 'সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিকস বাংলাদেশ নামীয় একটি অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশের ইসলামী অর্থনীতি জগতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। একটি নতুন সংযোজন। একটি নতুন অধ্যায়।

দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষার মানোন্নয়নে হযরতের ব্যাপক কর্মতৎপরতা :

বিশ্বখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে কওমী মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স সমমান) সমাপ্তির পর একই প্রতিষ্ঠান হতে ইতিহাসের সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে অর্জন করেন মুফতী সনদ। অতঃপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠতা মুহতামিম কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা শাহ মুফতী আজিজুল হক সাহেব (রহ.) নির্বাচিত করেন জামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে। এতে করে তিনি পদার্পণ করলেন এক নতুনাঙ্গনে। ধারাবাহিক অতিক্রম করতে লাগলেন একেকটি ধাপ। অর্পিত দায়িত্বের পাশাপাশি সারা দেশের দ্বীনি মাদরাসাসমূহের তালীম-তারবিয়াত তথা শিক্ষা-দীক্ষার মানোন্নয়নে ছিলেন সদাসর্বদা উৎকণ্ঠিত। উদগ্রীব

সে সময়ের কোনো এক সন্ধিক্ষণে হযরত মুফতী সাহেব হুজরের নিকট আসে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের কতিপয় দ্বীনপিপাসু মুসলমানের এক আকুল আবেদন। উদ্দেশ্য–পশ্চাৎপদ এতদাঞ্চলের মানুষের দ্বীনি চাহিদা পূরণার্থে বিজ্ঞ, দক্ষ, চতুর ও মুত্তাকী একজন আলেমকে শিক্ষক ও দাঈ রূপে প্রেরণ।

হযরত মুফতী আজিজুল হক সাহেব (রহ.) তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তম স্বার্থে তাঁর (ফকীহুল মিল্লাত) কর্মচাঞ্চল্যতা, জাগ্রত চেতনা, শাণিত মেধা-প্রজ্ঞা ও তাঁর ভেতর অন্তর্নিহিত উম্মতের দরদ-ব্যথা অনুভবকরত ১৯৬২ সালে তাঁকে প্রেরণ করেন উত্তরবঙ্গে।

তিনি অত্যল্প সময়ের ব্যবধানে গড়ে তোলেন পুরো এলাকায় দ্বীনি পরিবেশ। যার জলন্ত প্রমাণ দেশের শীর্ষ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান জমিল মাদরাসা বগুড়া। বিগত ১৯৯৩ সালে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের এক বিশাল উলামা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৃহত্তম ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বগুড়া জামিল মাদরাসার জামে মসজিদে। সৌভাগ্যক্রমে সেই সমাবেশে যোগদানের সুযোগ হয়েছিল আমারও। অনুষ্ঠিত উলামা সমাবেশে ওলামায়ে কেরাম অকুণ্ঠচিত্তে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, বর্তমান উত্তরবঙ্গের প্রায় শত শত দ্বীনি মাদরাসার সবখানে কোনো না কোনোভাবে রয়েছে হযরত মাওলানা মুফতী আবদুর রহমান সাহেবের (রহ.) অবদান (আল্লাহু আকবর! সবই আল্লাহ তা'আলার অনুদান, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন দান)।

সেই যাই হোক দীর্ঘ আট বছরের সফল মিশনের ইতি টেনে পুনরায় তিনি প্রত্যাবর্তন করেন পটিয়া মাদরাসায়। এতদপর হতে আল-জামিয়া প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফতী আজিজুল হক সাহেব (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস' তথা কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে সংযুক্ত সকল দ্বীনি মাদরাসার শিক্ষা-দীক্ষার মানোন্নয়নে একান্ত মেহনত অব্যাহত রাখেন দিবা-রাত্রি।

১৯৯০ সালে পটিয়া মাদরাসা থেকে ভিন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন জেলাভিত্তিক গঠন করেন 'তানজিমুল মাদারিস' তথা কাওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। এবার পুরো উদ্যোমে চালু করেন এক নতুন মিশন। সর্বোপরী বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের ১৬ জেলার প্রায় ১১০০ মাদরাসার সমন্বয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'তানজিমুল মাদারিসিল কওমিয়্যাহ্' নামক একটি স্বতন্ত্র কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। আর উক্ত বোর্ডের আজীবন চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি পালন করেন সংযুক্ত সকল মাদরাসার শিক্ষা-দীক্ষা ও হিসাব-নিকাশ তদারকির গুরু দায়িত্ব।

মরহুম ফকীহুল মিল্লাতের সুদীর্ঘ কর্মজীবনের অসাধারণ সফলতা, বিরল অভিজ্ঞতা, অকল্পনীয় দূরদর্শিতা, আকাবিরে দ্বীনের পরম বাধ্যতা ও অদ্বিতীয় দ্বীনি ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মনোনীত হন সারা বাংলাদেশে বৃহত্তর পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে চার বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত কওমী মাদরাসাসমূহের সর্বোচ্চ সংগঠন 'সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড' চেয়ারম্যান পদে। মহাপ্রতাপশালী রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলার দরবারে কামনা–আয় মাওলা! আপনি তাঁর সকল মিশনকে সচল ও সজীব রেখে দান করুন উত্তরোত্তর সফলতা। আমীন।

হাদীস শরীফে আছে–

عن أبى هريرة :عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادى جبريل فى أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض (صحيح البخارى ٣/١١٧٥)

'কোনো মুমিন বান্দাকে মহান আল্লাহ যখন পছন্দ করেন, সকলের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন তাঁর প্রতি আকর্ষণ ও মোহাববত। প্রেম ও ভালোবাসা। এমনকি একপর্যায়ে ভূধরাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার গ্রহণযোগ্যতা। মকবুলিয়্যাত। সম্ভবত এরই প্রতিফলনস্বরূপ সর্বস্তরের জনতা প্রকাশ করতেন তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। দ্বীনপ্রিয় অর্থশালীগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতেন তাঁর হাত ধরে জনকল্যাণমূলক কাজে। এ জন্যই তো উপরিউক্ত সমূহ প্রকল্প ছাড়াও দ্বীনদার দুস্থদেরকে হজে প্রেরণ প্রকল্প, অসহায় পরিবার ও বিধবা ভাতা প্রকল্প, মাসিক 'আল-আবরার' প্রকল্প, সমসাময়িক জটিল সমস্যাসমূহের সম্মিলিত ইসলামী সমাধান বের করার জন্য জাতীয় মুফতীগণের সমন্বয়ে ফিকহী সেমিনার প্রকল্প, দেশব্যাপী জেলা পর্যায়ের ইসলাহী জোড় ও বসুন্ধরা মাদরাসায় ষান্মাসিক জাতীয় ইসলাহী জোড় (আত্মশুদ্ধিবিষয়ক অনুষ্ঠান) প্রকল্প, গরিব-মিসকিন জটিল দূরারোগ্য রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প, মুসলমানদের অতীব প্রয়োজনীয় পুস্তিকাদি খরচ অনুপাত মূল্যে বিতরণ প্রকল্প, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও কোরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা-বর্ণনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পরিচালিত প্রথমে আঞ্চলিক, পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ের ইসলামী সম্মেলন সংস্থা প্রকল্পসহ সামাজিক ও মানবিক অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে। যা বিশদভাবে বর্ণনা করা সম্ভবপর হলো না এ ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে।

পরিসমাপ্তিতে হযরতের সকল ভক্ত, অনুরক্ত, শিষ্য, শুভাকাঙ্ক্ষী ও তাঁর আদর্শপ্রেমী সকলের সকাশে অধমের বিনীত অনুরোধ, আমরা যেন তাঁর গৌরবোদ্দীপ্ত আদর্শসমূহের যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর আদর্শে আদর্শিত হওয়ার প্রাণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। তাঁর রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত কাজসমূহে পূর্ণতা আনয়নে উদ্যমতা চালু রাখি। বিষাদ মর্মে বিদায়বারি-বিধৌত নেত্রে চাতকের ন্যায় যেন শুধু চেয়ে না থাকি। এই কামনায়...

'মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন'

লেখক :
হযরতের অন্যতম খলীফা ও
মুহতামিম, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া টেকনাফ।

অমুসলিম দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের পাথেয়

হিজরতে হাবশা

মুফতী শরিফুল আজম

মুসলমানদের ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব অপরিসীম। নবীজির (সা.) আদর্শ মুসলমানদের জীবন পরিচালনার পাথেয় এবং হেদায়াতের মাপকাঠি। বিশ্বের যেকোনো দেশে, যেকোনো অঞ্চলে মুসলমান বসবাস করুক না কেন, সুন্নাতের অনুসরণ তাদের শিরোধার্য। তাই নিজেদের সকল সমস্যার সমাধান নবীজির (সা.) আদর্শের মাঝে খুঁজে বের করতে তারা সচেষ্ট।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যার এক বৃহদাংশ এমন সব দেশে বাস করে, যেখানে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা ক্ষমতা নেই। অমুসলিমরাই সেখানে সংখ্যাগুরু বা রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক। এ সকল দেশে মুসলিম নাগরিকগণ সংখ্যালঘু হওয়ার দরুন প্রতিনিয়ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সভ্যতাগত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এর মোকাবিলায় মুসলমানরা একদিকে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও সমাজব্যবস্থার আশ্রয় নেয়, অন্যদিকে কোরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনার প্রতিও লক্ষ রেখে চলে। এভাবে তারা ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে সমন্বয় সাধন করে চালিয়ে যায় টিকে থাকার লড়াই।

এ ক্ষেত্রে নবীজি (সা.)-এর পবিত্র সিরাতে দুটি দিকই সর্বাধিক অনুসৃত হয়ে থাকে। এক. মক্কি জীবন, দুই. মাদানী জীবন। স্থান-কালের ব্যবধানে কেউ মক্কি জীবনের অনুসরণে কর্মপন্থা ঠিক করে থাকে, আবার কেউ মাদানী জীবনের অনুরূপ আদর্শ জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। স্বস্থানে উভয় পদ্ধতি মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে নবীজি (সা.)-এর পবিত্র সিরাতে তৃতীয় আরেকটি দিক রয়েছে, যা অমুসলিম দেশে বসবাসরত মুসলিমদের সরাসরি দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে। আর তা হচ্ছে হিজরতে হাবশার ঘটনা। নবীজি (সা.)-এর পরামর্শক্রমে সাহাবাদের একদল তৎকালীন খ্রিস্টরাজ্য হাবশায় হিজরত করেছিলেন। একটি অমুসলিম দেশে মুষ্টিমেয় মুসলমানদের হিজরত, তাও আবার স্বয়ং নবীজি (সা.)-এর পরামর্শে? কী ছিল তার প্রেক্ষাপট আর ইতিহাস। নিজেদের ঈমান-আমল বাঁচিয়ে এমন দেশে সাহাবায়ে কেরাম দীর্ঘ এক যুগ সময় কিভাবে কাটালেন এবং পরবর্তী উম্মতের জন্য তাঁরা কী আদর্শ রেখে গেলেন। এ সকল বিষয় নিয়েই আজকের আলোচনা।

প্রেক্ষাপট :

নবুওয়াতের পঞ্চম বছর। সকল প্রকার বাধা ডিঙিয়ে ইসলামের প্রচার এগিয়ে চলছিল। ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল আর নবীজি (সা.) তা তেলাওয়াত করে করে লোকদের শোনাচ্ছেন। তাঁর পবিত্র মুখে কোরআনের বাণী শুনে সত্যবরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় মানুষ প্রমত্ত হয়ে উঠছিল।

মক্কার কাফের-মুশরিকগণ ইসলামের এই অগ্রযাত্রা রোধে নবীজি (সা.)-কে হত্যার নানা ফন্দি করেও ব্যর্থ হলো। অবশেষে কুরাইশদের পরামর্শসভা বসল। কিভাবে ইসলামের মূলোৎপাটন করে পৌত্তলিকতার অস্তিত্ব রক্ষা করা যায়। তা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হলো। নানা আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো যে সকলেই নিজ নিজ গোত্রের যে সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে শাসন করবে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম পরিত্যাগ করে পূর্বের ধর্মে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে থাকবে। এভাবে বলপূর্বক তাদেরকে ইসলাম পরিত্যাগে বাধ্য করা গেলে মুহাম্মদ (সা.) দুর্বল হয়ে পড়বেন।

উৎপীড়ন :

সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানগণ নিজ নিজ গোত্রের হাতে বন্দি হলেন এবং অভিভাবকদের হাতে উৎপীড়িত হতে লাগলেন। কিন্তু বেচারা সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র মুসলমানদের ওপর জুলুমের পাহাড় ভেঙে পড়ল। তাঁদের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন আরম্ভ হয়েছিল, ইতিহাসে তার তুলনা আছে বললে জালেম কুরাইশদের 'মানহানি' করা হবে।

হযরত বেলাল (রা.) গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। জানতে পেরে তাঁর মনিব উমাইয়া তাঁর ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাতে লাগল। চাবুকের আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে বলতে লাগল–ভালো চাস এখনই মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম ত্যাগ কর। কিন্তু হযরত বেলাল (রা.) কিছুতেই রাজি হলেন না। উমাইয়া এক অদ্ভুত শাস্তির ব্যবস্থা করল। গলায় দড়ি বেঁধে মক্কার বালকদের হাতে হযরত বেলাল (রা.)-কে তুলে দিল। দুষ্ট বালকরা হেঁচকা টান মেরে তাঁকে মাটিতে ফেলে হৈ হৈ করে দড়ি ধরে টানত। দিনশেষে অর্ধমৃত অবস্থায় উমাইয়ার বাড়িতে ফেরত দিত। দুপুরবেলায় প্রখর রৌদ্রতপ্ত

মরু বালুকায় হযরত বেলাল (রা.)-কে হাত-পা বেঁধে চিত করে শুইয়ে প্রকাণ্ড এক পাথর চাপা দেওয়া হতো। সারা শরীর ঝলসে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত, তখন উমাইয়া এসে বলত এখনো সময় আছে ওই নতুন ধর্ম ত্যাগ কর। উত্তরে হযরত বেলাল (রা.) শুধু বলতেন–আহাদ, আহাদ। তিনি এক, অদ্বিতীয়।

হযরত খাব্বাব (রা.) তামিম বংশীয় লোক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে জ্বলন্ত আঙ্গারা মাটিতে বিছিয়ে তাঁর ওপর হযরত খাব্বাব (রা.)-কে চিত করে শোয়ানো হতো এবং কয়েকজন পাষণ্ড তাঁর বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে রাখত। পিঠের নিচে চাপা পড়ে আঙ্গারাগুলো নিভে গেলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হতো।

হযরত আম্মার (রা.) পিতা-মাতাসহ সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কুরাইশদের অত্যাচারে তাঁর পিতা হযরত ইয়াসির (রা.) এবং মাতা হযরত সুমাইয়া (রা.) শহীদ হয়ে যান। একদিন এই ভক্ত পরিবারকে ভীষণভাবে অত্যাচারিত হতে দেখে নবীজি (সা.) অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেছিলেন, হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্যধারণ করো। তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানদের ওপরও কম নির্যাতন হয়নি। হযরত উসমান (রা.) সমাজে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর চাচা হাত-পা বেঁধে তাঁকে বেদম প্রহার করে। হযরত যুবাইর বিন আওয়ামকে তাঁর চাচা চাটাইয়ের ভেতর পেঁচিয়ে ধোঁয়া দিত এবং বলত, বাঁচতে চাইলে মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর।

হিজরতের অনুমতি :

যখন অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) নিরাপত্তার জন্য মূর্ত রহমত নবীজির (সা.) মন অস্থির হয়ে উঠল। তৎকালীন আবিসিনিয়ার (হাবশা) খ্রিস্টান সম্রাট নাজ্জাশি ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক বলে সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিশেষত কুরাইশদের কাছে তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। অতি পূর্বকাল হতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে কুরাইশদের সেথায় যাতায়াত ছিল। তাই হাবশার অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তারা সম্মক জ্ঞাত ছিল। নবীজির (সা.) সার্বিক বিবেচনায় হাবশা ছিল নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলমানদের ধর্মকর্ম পালনের নিরাপদ স্থান। সে মতে তিনি সাহাবাদের হাবশায় হিজরত করার পরামর্শ প্রদান করলেন।

হাবশা :

লোহিত সাগরের পাড়ঘেঁষা পূর্ব আফ্রিকার দেশ হাবশা বা আবিসিনিয়া। পরবর্তীতে নামকরণ হয় ইথিওপিয়া। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ নদী নীল নদের একাংশ বয়ে গেছে হাবশার ভেতর দিয়ে। হাবশার সম্রাটদের উপাধি ছিল নাজ্জাশি। যেমন–পারস্য রাজের উপাধি কেসরা, তুর্কি বাদশার উপাধি খাকান, মিসরের ফেরাউন এবং ইউনানের সম্রাটদের উপাধি কতলিমুস। সম্রাট যে-ই হতো তাঁকেই এই উপাধিতে ভূষিত করা হতো। হিজরতে হাবশায় বর্ণিত নাজ্জাশীর প্রকৃত নাম ছিল আসহামা বিন আবজর। আসহামা (اصحمة) অর্থ- عطية মানে দান-দক্ষিণা।

প্রথম হিজরত :

নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রজব মাস। নবীজি (সা.)-এর অনুমতি লাভ করে আল্লাহর প্রেমিক ১১ জন পুরুষ এবং পাঁচজন মহিলা ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, স্বদেশ ও স্বজাতিকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে অজানা দুর্গম দেশ হাবশার দিকে যাত্রা করলেন। কুরাইশগণ জানতে পারলে বাধা সৃষ্টি করে কি না–এ ভয়ে হিজরতের বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন রাখা হলো। প্রয়োজনীয় সামানাসহ ১৬ জনের ক্ষুদ্র কাফেলা লোহিত সাগরের তীরবর্তী শু'আইবা বন্দরে নিরাপদে পৌঁছে গেল। এটা ছিল হাবশায় সাহাবায়ে কেরামের প্রথম হিজরত। এ যাত্রায় সফরসঙ্গী কতজন ছিলেন, তা নিয়ে ইতিহাসে বিভিন্ন মত লক্ষ করা যায়। নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ১৬ জন।

১. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) তিনি মুহাজির দলের আমির ছিলেন।
২. নবীজির (সা.) কন্যা এবং হযরত উসমানের (রা.) স্ত্রী হযরত রুকাইয়্যা (রা.)।
৩. কুরাইশদের প্রধান সরদার উতবার পুত্র হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)।
৪. তাঁর স্ত্রী হযরত সাহলা (রা.)।
৫. নবীজির (সা.) ফুফাতো ভাই হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রা.)।
৬. হযরত মুসআব বিন উমাইর (রা.)।
৭. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)।
৮. হযরত আবু সালামা (রা.)।
৯. তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা.) (পরবর্তীতে নবীজির (সা.) সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল)।
১০. হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.)।
১১. হযরত আমের বিন রবি'আ (রা.)।
১২. তাঁর স্ত্রী হযরত লায়লা বিনেত আবু হাসমা (রা.)।
১৩. হযরত আবু সাবরা (রা.)।
১৪. হযরত আবু হাতিব বিন আমর (রা.)।
১৫. হযরত সুহাইল (রা.)।
১৬. হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে সাহুল (রা.)।

মুহাজিরদের এ কাফেলা শু'আইবা বন্দরে পৌঁছে দেখতে পেলেন দুটি বাণিজ্য জাহাজ হাবশার উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এ জন্য জাহাজের মালিকগণও অতি অল্প ভাড়ায় তাঁদেরকে জাহাজে উঠিয়ে নিলেন। জনপ্রতি মাত্র পাঁচ দিরহাম ভাড়া দিতে হলো।

কুরাইশগণ যখন জানতে পারল যে কতিপয় শিকার তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে তখন তারা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল।

হাবশা যাত্রীদের ধরে আনতে শু'আইবা বন্দরে লোক পাঠাল। কিন্তু তারা বন্দরে পৌঁছে শুনতে পারল যে মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গেছে। এ যাত্রায় মুসলমানরা রক্ষা পেল।

মক্কার পরিস্থিতি :

মুষ্টিমেয় কতেক সাহাবী হিজরত করলেও অধিকাংশ তখনো মক্কায় নির্যাতিত। শত বাধার মাঝেই মুসলমানদের সংখ্যাও দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দিবসে যারা মুসলমানদের কট্টর বিরোধী হিসেবে নিজেকে জাহির করত রাতের আঁধারে আবার তারাই গোপনে নবীজি (সা.)-এর তেলাওয়াত শুনতে পঙ্গপালের ন্যায় ছুটে আসত।

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) কাবা ঘরে সূরা আন্ নাজম তেলাওয়াত করছিলেন। কুরাইশগণও সেখানে উপস্থিত ছিল। সকলে সেই সুললিত কণ্ঠের মনোমুগ্ধকর তেলাওয়াত শ্রবণ করছিল। নবীজি (সা.) যখন উক্ত সূরা শেষ করে তেলাওয়াতের সিজদা করলেন, তখন তাঁর সাথে সাথে উপস্থিত মুসলিম, মুশরিক, জিন এবং মানুষ সকলেই সিজদা করল। শুধু হাতেগোনা কয়েকজন হতভাগা ছাড়া কাফেরগণ সকলে সেদিন মুসলমানদের সাথে সিজদায় অবনত হয়েছিল। সূরা আন্ নাজমের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বহু নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে নবীজি (সা.) সিজদা করেছিলেন। অন্যদিকে এই সূরার মাঝে তাওহীদ ও রিসালাতের সত্যতার পূর্ণ তত্ত্ব এমন মাধুর্যপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে যে কাফেরগণ তা শ্রবণ করে ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে তন্ময় হয়ে পড়েছিল। অনিচ্ছাকৃতভাবেই তারা সত্যের প্রতি অভিভূত হয়ে নবীজি (সা.)-এর সাথে সিজদায় লুটে পড়েছিল। এ ঘটনার পর চতুর্দিকে একটি ভুল সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল যে মক্কার কুরাইশগণ মুসলমান হয়ে গেছে।

মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন :

হাবশায় পৌঁছে শান্তির পরিবেশে মুহাজিরদের তিন মাস কেটে গেল। এরপর মক্কার কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের গুজব হাবশায় পৌঁছে, যা নবীজি (সা.)-এর সাথে সিজদা করার ঘটনা থেকে রটে ছিল। মুহাজিরদের কাছে খবর এল যে মক্কা এখন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে নির্বিঘ্নে ইসলাম পালন করা যায়। এ খবর শুনে হাবশা থেকে সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় ফিরে এলেন। কিন্তু নগরীতে প্রবেশের পূর্বেই তাঁদের ভুল ভাঙল। জানতে পারলেন যে সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তখন কিছু লোক সেখান থেকেই আবার হাবশা ফিরে গেলেন। অবশিষ্ট কয়েকজন চুপে চুপে মক্কায় প্রবেশ করে বিভিন্ন প্রভাবশালী স্বজনদের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় হিজরত :

হাবশাফেরত সাহাবীদের ওপর কুরাইশদের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেল। পলাতক শিকার যেন পুনঃ ফাঁদে পতিত হয়েছে। কিছুদিন এভাবে কঠোর উৎপীড়নের ভেতর অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁরা পুনঃ হিজরত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এবার গোপনে বের হওয়া সহজ ছিল না। কুরাইশগণ সর্বদা তাঁদের গতিবিধি নজরদারিতে রাখত। এতদসত্ত্বে যেকোনোভাবে যেকোনো মূল্যে হিজরত করার সিদ্ধান্ত হলো। সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.)-এর ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা.) হাবশা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সাথে নবীজি (সা.)-এর একখানা পত্র নিয়ে গেলেন। পত্রে নবীজি (সা.) হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশিকে উদ্দেশ করে লিখলেন : আমার চাচাতো ভাই জাফরকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি, তাঁর সাথে আরো কয়েকজন মুসলমান রয়েছেন। আপনার কাছে এলে তাঁদেরকে মেহমানদারি করার অনুরোধ রইল। হাদীস ও সিরাতের রেকর্ড থেকে যতদূর জানা যায় এটাই ছিল কারো নামে লেখা নবীজি (সা.)-এর সর্বপ্রথম পত্র।

অন্য মুসলমানগণও কেউ সপরিবারে, আবার কেউ একাকী বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে হাবশায় পৌঁছলেন। দ্বিতীয় হিজরতে যাঁরা হাবশায় গিয়ে সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন নারী। হাবশায় পৌঁছে সকলে নিরাপদে কালাতিপাত করতে লাগলেন এবং নিঃসঙ্কোচে নিজেদের ধর্মকর্ম পালন করতে থাকলেন।

নতুন ষড়যন্ত্র :

মক্কার কুরাইশগণ যখন দেখল নাজ্জাশি মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাঁরা নিরাপদে ইসলাম পালন করছে, বিষয়টি তাদের বরদাশত হলো না। যেকোনো মূল্যে তাঁদেরকে দেশে ফেরত আনার সিদ্ধান্ত নিল।

হাবশার সাথে মক্কাবাসীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বহির্দেশে গমনে অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ প্রতিনিধিস্বরূপ আব্দুল্লাহ বিন রবিয়া ও আমর বিন আসকে নির্বাচন করে তাদের হাতে নাজ্জাশি এবং তার মন্ত্রিপরিষদের জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে হাবশায় পাঠানো হলো। হাবশায় আরবের চামড়ার খুব সমাদর ছিল। তাই উপঢৌকনের মাঝে অধিক পরিমাণ চামড়াজাত সামগ্রী দেওয়া হলো।

কুরাইশদের প্রতিনিধি হাবশায় পৌঁছে প্রথমে সকল মন্ত্রীর কাছে উপঢৌকন পেশ করে তাঁদের মন জয় করে নিল এবং মুহাজিরদের দেশে ফেরত পাঠাতে বাদশাহকে অনুরোধ করতে সম্মত করল। সর্বশেষে তারা বাদশাহর দরবারে উপঢৌকনসহ হাজির হয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য জানাল। বাদশাহকে তারা বলল, আমাদের দেশের কতেক নির্বোধ নওজোয়ান পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে আপনার দেশে চলে এসেছে কিন্তু আপনার ধর্ম গ্রহণ করেনি। তারা

এমন এক নতুন ধর্ম পালন করছে, যা আমাদের এবং আপনাদের ধর্মের বিপরীত। তাদের অভিভাবকগণ আমাদেরকে আপনার কাছে এ অনুরোধ নিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যেন তাদেরকে ফেরত পাঠান। তাদের অভিভাবকগণ তাদের বিচার করবেন। অর্থাৎ প্রতিনিধিদের দাবি হচ্ছে, মুহাজিরদের কোনো কথা না শুনেই তাদের হাতে সোপর্দ করে দেওয়া হোক।

তাদের এ প্রার্থনা শেষ হওয়া মাত্রই পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে সভাসদবর্গ সমস্বরে বলে উঠল–মহারাজ, কথা সত্য, তাদের ভালো-মন্দের বিচার তাদের অভিভাবকদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই সংগত। কিন্তু বাদশাহ নাজ্জাশি স্বভাবগতভাবে ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। তিনি এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি বললেন, আমি এভাবে তাদেরকে ফেরত পাঠাতে পারি না। যারা আমাকে ন্যায়পরায়ণ মনে করে আমার দেশে আশ্রয় নিয়েছে, আমি তাদের কথা শুনব। যদি তোমাদের দাবি সঠিক হয়, তবে ফেরত পাঠাব, অন্যথায় যথারীতি তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে যাব।

অগ্নিপরীক্ষা :

নাজ্জাশি সাহাবাদের ডেকে পাঠালে তারা পরামর্শে বসে স্থির করলেন যে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি সামলানোর কী ব্যবস্থা হতে পারে? কুরাইশদের পাতা জাল থেকে কিভাবে মুহাজিরদের হেফাজত করা যায়?

ইসলামের ইতিহাসে বিদেশের মাটিতে এটাই ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম মুকাদ্দমা। হযরত জাফর (রা.) ছিলেন মুসলমানদের মুখপাত্র। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে এমন বিপদের মুহূর্তে দুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

এক. আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর শিক্ষার বিপরীত কোনো কথা রাজদরবারে বলব না। এতে যা হয় হবে।

দুই. আমরা বাদশাহর ন্যায়নীতির সদ্ব্যবহার করব।

যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ইতিপূর্বে নবীজি (সা.)-এর কাছে বাদশাহর ইসাফের কথা শুনে এসেছেন এবং এখানে এসেও বাস্তবে তার বহু উদাহরণ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁদের মাঝে এ আত্মবিশ্বাস ছিল যে সত্য এবং ইনসাফের যুদ্ধে তাঁরাই বিজয়ী হবেন। অতএব তাঁরা বাদশাহর ইনসাফপূর্ণ নীতিমালার সদ্ব্যবহার করে আত্মরক্ষার কৌশল নির্ধারণ করলেন।

দরবারের কাঠগড়ায় :

উজির, নাজির, মন্ত্রী, পাদ্রি, সাধারণ দর্শক এবং বাদী-বিবাদীতে ভরপুর বাদশাহর দরবার। এমন এক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এজলাসে বাদশাহ নিজেই কুরাইশ প্রতিনিধিদের দাবি সকলের সামনে তুলে ধরলেন।

মুহাজিরদের মুখপাত্র হযরত জাফর (রা.) প্রথমে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য বাদশাহর মধ্যস্থতায় কুরাইশ প্রতিনিধিদের কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন।

এক. আমরা কি কারো ক্রীতদাস? যে তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি? যদি তা-ই হয়, তবে আমাদেরকে অবশ্যই ফেরত পাঠানো হোক।

নাজ্জাশি আমর বিন আসের কাছে জবাব তলব করলে তিনি বললেন–না, এরা সকলেই স্বাধীন এবং সম্ভ্রান্ত।

দুই. আমরা কি কাউকে খুন করে পালিয়েছি? যদি তা-ই হয়, তবে অন্যায়, হত্যার পণ হিসেবে আমাদেরকে নিহতের ওয়ারিশদের হাতে তুলে দেওয়া হোক।

নাজ্জাশি কুরাইশ প্রতিনিধিদের কাছে এর জবাব তলব করলে আমর বিন আস বললেন–না, এক ফোঁটা রক্তও ঝরায়নি।

তিন. আমরা কি কারো মাল লুট করে এনেছি? তাহলে আমরা তা ফেরত দিতে প্রস্তুত।

নাজ্জাশি এর জবাব তলব করতেই তারা অকপটে স্বীকার করল–না, এক পয়সাও ছিনিয়ে আনেনি।

সেদিন নাজ্জাশির আদালতে হযরত জাফর (রা.) কুরাইশদের অপবাদের জবাবে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন তা এতটাই যৌক্তিক, সময়োপযোগী ও আকর্ষণীয় ছিল যে উপস্থিত সকলের বিবেককে নাড়া দেয়। এতে কুরাইশদের অহেতুক বিদ্বেষ এবং মুহাজিরদের নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি সকলে বুঝে ফেলে। তথাপি বাদশাহ মোকাদ্দমা খারিজ না করে শুনানি চালিয়ে গেলেন। এবার কুরাইশদের অপবাদের জবাব সাহাবায়ে কেরামদের কাছে জানতে চাইলেন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কোন ধর্ম, যার কারণে তোমরা দেশ ছেড়েছো, আবার আমাদের ধর্মও গ্রহণ করোনি?

এই প্রশ্নের জবাবে হযরত জাফর (রা.) নিজেদের অবস্থান এবং ইসলামের মহান শিক্ষাকে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে দূরদর্শিতার সাথে তুলে ধরলেন। ইতিহাসে যা স্বর্ণাক্ষরে ঠাঁই করে নেয়।

মুসলমানের পক্ষ হতে তিনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন। 'রাজন' আমরা ছিলাম অজ্ঞ ও বর্বর জাতি। আমরা আল্লাহকে ভুলে এত দিন নানা দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করতাম। মৃত জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ করতাম। আমাদের অন্তর নানা প্রকার কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আমরা আত্মীয়স্বজনের প্রতি দুর্ব্যবহার করতাম। প্রতিবেশীর ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করতাম এবং সর্বদা আত্মকলহে নিমগ্ন থাকতাম। আমাদের সবলগণ দুর্বলদের গ্রাস করে ফেলত। মোটকথা, আমাদের মধ্যে অনাচার, অবিচার ও অসদ্ব্যবহারের অবধি ছিল না। ঠিক এই দুর্দিনে আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন। তিনি পূর্ব হতেই আমাদের মধ্যে বংশমর্যাদায় সত্যনিষ্ঠায়, বিশ্বস্ততায় ও চরিত্রের

নির্মলতায় সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি অভির্ভূত হয়ে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করতে এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে আমাদের আহ্বান করলেন।

তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা পুতুল, প্রতীমা, চন্দ্র-সূর্য, বৃক্ষ-প্রস্তর, ভূত-প্রেত প্রভৃতি পূজা পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো। সত্য কথা বলো। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার করো, নামায পড়ো, রোযা রাখো, যাকাত দাও, পরোপকার করো, আর্ত ও পীড়িতদের সেবা করো, মিথ্যা কথা বলো না, অত্যাচার, ব্যভিচার, ইয়াতীমের সম্পত্তি গ্রাস, সতী-সাধ্বী নারীর চরিত্রে কলংক আরোপ করো না। সর্বদা, সর্বপ্রকার কলুষতা থেকে সকলকে পবিত্র রাখবে।

তাই আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। তিনি আমাদেরকে যেসব কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তা-ই করি এবং যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা হতে দূরে থাকি।

'মহাত্মন' আমরা এই পবিত্র ধর্মগ্রহণ করেছি বলে আমাদের আত্মীয়স্বজন এবং কুরাইশ দলপতি আমাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেছে, অনন্যোপায় হয়ে আমরা দেশত্যাগী হয়েছি। এবং স্বয়ং আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আপনার ন্যায়বিচারের কথা শুনিয়ে আমাদেরকে আপনার রাজ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন তারা আমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে অত্যাচার করার জন্যই আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছে।

শাহেন শাহ,

আপনি যদি তাদের প্রার্থনা অনুযায়ী আমাদেরকে ফিরে যেতে আদেশ দেন, তবে এবার আর আমাদের রক্ষা নেই।

হযরত জাফর (রা.)-এর ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করে বিস্ময়-বিমুগ্ধ নাজ্জাশি বললেন–

তোমাদের রাসূলের প্রতি আল্লাহর যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, এর কিছু অংশ আমাকে শোনাতে পারো কি? তখন হযরত জাফর (রা.) সূরা মারইয়াম হতে হযরত ঈসা (আ.) ও তদীয় মাতা হযরত মরিয়ামসংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত সুললিত কণ্ঠে পাঠ করলেন।

পবিত্র কোরআনের মাধুর্যপূর্ণ ভাষা, সরল ও বোধগম্য যুক্তিতর্ক এবং ইসলামের সত্যপ্রিয়তার উদার ভাবাবেগে সভাস্থ জনমণ্ডলী অভিভূত হয়ে পড়ল।

নাজ্জাশি আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। তাঁর নয়ন যুগল হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে শ্মশ্রুরাজি সিক্ত হতে লাগল।

বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে নাজ্জাশি করুণ স্বরে বলতে লাগলেন, এই পবিত্র বাণী এবং হযরত ঈসা (আ.) যে বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন উভয় একই প্রদীপের আলো। অতপর কুরাইশ প্রতিনিধিদেরকে বললেন, তোমরা চলে যাও, তোমাদের প্রার্থনা নামঞ্জুর। আমি তাদেরকে কিছুতেই তোমাদের হাতে তুলে দেব না।

নতুন দুরভিসন্ধি :

কুরাইশ প্রতিনিধিরা মোকাদ্দমায় হেরেও নমনীয় হলো না। তারা দেখল যে আজ মুসলমানরা পৌত্তলিকতা আর শিরকের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য দিয়েছে তা বাদশাহর ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়ায় বাদশাহ তাদের অনুকূলে রায় দিয়েছেন।

আগামীকাল বাদশাহর দরবারে তৃত্ববাদের বিষয়ে প্রশ্ন উঠাতে হবে যে মুসলমানরা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর বান্দা মনে করে। বাদশাহর ধর্ম বিশ্বাসের বিপরীত মুসলমানগণ বক্তব্য দিলে নিশ্চয়ই বাদশাহ বিগড়ে যাবেন।

পরের দিন রাজদরবারে গিয়ে পুনরায় নতুন চার্জশিট দাখিল করে দিল যে মুসলমানরা ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করে না। বাদশাহর কাছে তারা দাবি জানাল যে মুসলমানদের কাছে এর জবাব তলব করা হোক।

সংবাদ পেয়ে মুসলমানরা পেরেশান হয়ে গেলেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারীনি হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, আমরা আর কখনো এমন বিপদে পড়িনি। কারণ হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে খ্রিস্টান মতের সাথে কোরআনের বক্তব্যের ঘোর বিরোধ বিদ্যমান। এ কথা প্রকাশ হয়ে গেলে নাজ্জাশি আবার আমাদের ওপর চটে যান কি না? অন্যদিকে যে একত্ববাদের জন্য দেশ ত্যাগ করেছেন, সকল নির্যাতন সয়ে এসেছেন তা গোপন করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সাহাবাদের নিয়ে হযরত জাফর (রা.) আবার পরামর্শে বসলেন। এবারো সিদ্ধান্ত হলো, যা হবার হবে, আমরা সত্যকে প্রকাশ করব। বাদশাহর পছন্দ-অপছন্দের পরোয়া করব না।

মুসলমানগণ সমবেতভাবে রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। রাজা নাজ্জাশি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা ঈসা (আ.) সম্বন্ধে কী মত পোষণ করো? বীর কেশরী হযরত জাফর (রা.) নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান হয়ে উত্তর করলেন–হে সম্রাট, আমাদের নবী (সা.) আমাদেরকে হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে যা শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা তা-ই বিশ্বাস করি। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না।

তিনি বলেছেন–

هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول

তিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ এবং তাঁর কালেমা। কুমারী সতী-সাধ্বী হযরত মারইয়ামের গর্ভে তাঁকে আবির্ভূত করেছেন।

এ কথা শুনে নাজ্জাশি উৎফুল্লচিত্তে মৃত্তিকা হতে একগাছা সূক্ষ্ম কুটা কুড়িয়ে হাতে নিয়ে বললেন, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আমাদের এবং তোমাদের ধর্ম মতে আমার হস্তস্থিত এই তৃণবৎ পার্থক্যও নেই। তোমরা যা বলেছো, ঈসা (আ.) তদপেক্ষা বেশি আর কিছুই নন।

নাজ্জাশির এই উক্তি শ্রবণ করে সভাসদ

পাদ্রিগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং রাগে গড়গড় করতে লাগল।

কিন্তু নাজ্জাশি ধমক দিয়ে তাদের থামিয়ে দিলেন। তারপর তিনি কুরাইশ প্রতিনিধিগণকে কঠোর স্বরে বললেন, তোমরা চলে যাও। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমস্ত উপঢৌকনও তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন।

এভাবে কুরাইশ প্রতিনিধিদলের শেষ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো এবং তারা সর্বপ্রকার বঞ্চিত হয়ে হতাশ মনে হাবশা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো।

নাজ্জাশির ইসলাম গ্রহণ :

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, বাদশাহ নাজ্জাশি শুধু মুসলমানদের পক্ষে রায় দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি সত্য ধর্ম ইসলামের সন্ধান পেয়ে তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.)-এর বর্ণনায় এ কথাও এসেছে যে, নাজ্জাশি সেদিন বলেছিলেন, যদি আমার ওপর রাজ্যের ভার না থাকত তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর পাদুকা বহন করতাম।

বিদ্রোহ দমন :

রাজদরবারের এমন জাঁকজমকপূর্ণ এজলাসে ইলামের সমর্থন এবং তৃত্ববাদের বিরোধিতার ফলে খ্রিস্টান পাদ্রি ও সাধারণ প্রজারা বাদশাহ নাজ্জাশির (রা.) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল। বিদ্রোহ দমাতে বাদশাহ একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। এক টুকরো কাগজে লিখলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ঈসা ইবনে মরিয়ম আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর পক্ষ থেকে আগত রুহ এবং তাঁর বাণী, যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট। এরপর কাগজটি তাঁর আলখেল্লার ডান কাঁধের দিকে গুঁজে রাখলেন। এবার প্রজাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সকলে বাদশাহকে ঘিরে ধরল। বাদশাহ বললেন, হে হাবশাবাসী! আমি কি তোমাদের আপনজন নই? সকলে বলল–হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, চারিত্রিক বিচারে আমাকে কেমন পেয়েছো। সকলে একবাক্যে বলল, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাহলে তোমরা বিদ্রোহ করছো কেন? তারা বলল, আপনি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন এবং ঈসা (আ.)-কে বান্দা আখ্যা দিয়েছেন। বাদশাহ বললেন, ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে তোমাদের বক্তব্য কী? প্রজারা বলল, তিনি আল্লাহর পুত্র। বাদশাহ নিজের হাত আলখেল্লার কাগজ লুকিয়ে রাখা স্থানে রেখে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত ঈসা (আ.)-এর চেয়ে বেশি কিছু নন। অর্থাৎ কাগজে লেখা বিষয়ের চেয়ে বেশি কিছু নন। এ কথা শুনে বিদ্রোহীরা আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল। এভাবে কৌশলে তিনি বিদ্রোহ দমন করে ফেললেন।

মুসলিম বসতি :

মোকাদ্দমায় জেতার পর মুহাজিরগণ নিশ্চিন্ত মনে বসবাস আরম্ভ করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর সেথায় সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান ছিল। এর মাঝে অনেকে বিয়েশাদি করেছেন এবং তাঁদের সন্তানাদি হয়েছে। বিভিন্ন নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় যে মুহাজিরদের আবাদী নাজ্জাশির রাজপ্রাসাদের আশপাশেই ছিল। সেখানে শতাধিক লোকের একটি কলোনি গড়ে উঠেছিল। এটা ছিল হাবশায় প্রথম মুসলিম কলোনি।

মুহাজির সাহাবাগণ হাবশার স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। যার ফলশ্রুতিতে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ইসলাম গ্রহণ করেন।

বাদশাহকে সহযোগিতা :

মুহাজির সাহাবাগণ যত দিন হাবশায় অবস্থান করেছেন বাদশাহকে সার্বিক সহযোগিতা করে গেছেন এবং তাঁর কামিয়াবীর জন্য দু'আরত থেকেছেন। একবার অকস্মাৎ এক ঘটনা ঘটল। হঠাৎ একদল শত্রু এসে নাজ্জাশি (রা.)-এর রাজ্যে আক্রমণ করল। পরিস্থিতি খুবই ভীতিকর হয়ে উঠল। স্বয়ং নাজ্জাশি রণাঙ্গনে গমন করলেন। মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের আশ্রয়দাতা পরম হিতাকাঙ্ক্ষী নাজ্জাশির বিপদে যারপরনাই মর্মাহত হলেন। সারা রাত জাগ্রত থেকে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে নাজ্জাশির জন্য দু'আ করতে লাগলেন। সাথে সাথে বাদশাহর সাহায্যে নিজেরা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। এরই অংশ হিসেবে যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য একজনকে রণাঙ্গনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হলো। হযরত যুবায়ের (রা.) ছিলেন মুহাজিরদের মাঝে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ। তিনি এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যুদ্ধক্ষেত্র ছিল নীল নদের ওপারে। হযরত যুবায়ের (রা.) মশকের সাহায্যে সাঁতরে নদী পার হয়ে রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধে নাজ্জাশি জয়লাভ করায় মুসলমানদের আর অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। হযরত যুবায়ের (রা.) কয়েক দিন পর ফিরে এসে বিজয়ের সুসংবাদ শোনালেন। সংবাদ শুনে দেশময় আনন্দ-কোলাহল পড়ে গেল এবং হাবশীগণ মুসলমানদেরকে অতি সম্মানের চোখে দেখতে লাগল।

পথের কাঁটা দূর হলো :

হাবশার কতেক দুষ্ট প্রকৃতির যুবক ইতিপূর্বে মুসলিম রমণীদের উত্ত্যক্ত করত এবং পথে-ঘাটে দেখতে পেলে বিভিন্নভাবে ঠাট্টা-মশকারা করত। নিজেদের দুর্বল অবস্থানের কারণে মুহাজিরগণ এর প্রতিবাদ করতে অপারগ ছিলেন। ব্যাপারটি ছিল তাদের জন্য পীড়াদায়ক। কিন্তু সবর করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ ছিল না।

ঘটনাক্রমে ওই উশৃঙ্খল যুবকদের সকলেই নাজ্জাশির সাথে উল্লিখিত যুদ্ধে গমন করে এবং সবাই নিহত হয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা কুদরতিভাবে মুহাজিরদেরকে তাদের অত্যাচার থেকে

পরিত্রাণ দান করেন।

নবীজি (সা.)-এর শিক্ষা :

হযরত জাফর (রা.) নাজ্জাশির (রা.) দরবারে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তাতে নবীজি (সা.)-এর চৌদ্দটি পবিত্র আদর্শের উল্লেখ ছিল।

১. তাওহীদ। ২. সততা। ৩. আমানতদারী। ৪. আত্মীয়তা রক্ষা। ৫. প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার। ৬. হারাম থেকে বেঁচে থাকা। ৭. রক্তপাতে না জড়ানো। ৮. অশ্লীলতা পরিহার। ৯. মিথ্যা না বলা। ১০. এতিমের মাল থেকে সতর্কতা অবলম্বন। ১১. নারীদের প্রতি কোনো অপবাদ না দেওয়া। ১২. নামায কায়েম করা। ১৩. যাকাত আদায় করা। ১৪. রোযা রাখা।

এ সকল শিক্ষার মাঝে ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক সকল বিষয়ের দিকনির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। মূলত ইসলামী জীবনব্যবস্থার ভিত্তি এ সকল মৌলিক শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষণীয় যত বিষয় :

মুহাজির সাহাবাদের বিরুদ্ধে হাবশার আদালতে দায়েরকৃত মোকাদ্দমা, তাদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, আদালতে প্রদত্ত বক্তব্য এবং সাহাবাদের আচার-ব্যবহারসহ হিজরতে হাবশার ঘটনা থেকে সংখ্যালঘু মুসলমানদের যে সকল বিষয় শেখার রয়েছে তার একটি রূপরেখা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. ঈমান-আমল নিয়ে বেঁচে থাকতে তুলনামূলক নিরাপদ শহরে অবস্থান করা। প্রয়োজনে এমন স্থানে হিজরত করে চলে যাওয়া। এতে হিজরতের সাওয়াব পাওয়া যাবে, যদিও তা অমুসলিম দেশ হয়। নবীজি (সা.) অমুসলিম দেশেই হিজরতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২. মুসলমান যেখানেই থাক, যেকোনো পরিস্থিতির স্বীকার হোক, সর্বাবস্থায় সদা সত্য কথা বলবে। সত্য পথে চলবে। সততাই হবে তাদের চালিকাশক্তি। হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে নাজ্জাশির আদালতে সত্য প্রকাশ করায় মুহাজিরদের কোনো ক্ষতি হয়নি বরং তাঁরা লাভবান হয়েছেন।

৩. কারো চাপে পতিত হলে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার পরিবর্তে কৌশলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বাদশাহ নাজ্জাশি বিদ্রোহীদের দমাতে এমন কৌশলই অবলম্বন করেছিলেন। এটা মিথ্যা হবে না, এমন কৌশল অবলম্বনের বৈধতা ইসলামে রয়েছে।

৪. দেশবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত অত্যন্ত হেকমতের সাথে যুক্তি ও দলিল-প্রমাণসহ পেশ করতে হবে। ক্ষমতার মোকাবিলা সর্বদা কৌশলে করার চেষ্টা করবে। সংখ্যালঘুদের জন্য এটা খুবই কার্যকরী হাতিয়ার।

৫. যে দেশে থাকবে, সে দেশের হিতকামনা করবে এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে নিজেদেরকে ফুটিয়ে তুলবে। নাজ্জাশির বিজয়ের জন্য মুহাজিরদের দু'আ এবং যুদ্ধের খোঁজখবর নেওয়া এরই প্রমাণ বহন করে।

৬. রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন এবং ন্যায়নীতি সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। যাতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় এর সদ্ব্যবহার করা যায়। নাজ্জাশির দরবারে গিয়ে হযরত জাফর (রা.) এ বিষয়ে পূর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

৭. যে দেশে বা শহরে অবস্থান করবে, সেখানে শান্তিপ্রিয় প্রজা হিসেবে বসবাস করবে। চরমপন্থা অবলম্বন করা যাবে না। হযরত জাফর (রা.)-এর বক্তব্যে প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকার ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরা হয়েছিল।

৮. মুসলমানরা যে দেশে বসবাস করুক না কেন, সেখানে অবশ্যই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে। নিজেদের মাঝে একজন আমির, জিম্মাদার বা মুরব্বি বানিয়ে নেবে। পরামর্শ সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। হযরত জাফর (রা.)-এর নেতৃত্বে পরামর্শ করে সংকটের মোকাবিলার ঘটনা থেকে এ শিক্ষাই পাওয়া যায়।

৯. নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মনোভাব, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ধর্ম বিশ্বাস ও কর্মপন্থা ইত্যাদি বিষয়ে দেশবাসীকে স্বচ্ছ ধারণা দেবে, যাতে কোনোরূপ ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। মুসলমানদেরকে যেন কেউ নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করতে না পারে এবং ইসলামের কোনো বদনাম না হয়। এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। হযরত জাফর (রা.) তাঁর পুরো বক্তব্যের মাঝে এ চেষ্টাই করেছিলেন।

১০. স্বদেশীয় লোকদের ধর্ম বিশ্বাস, এবং ধর্মীয় রীতিনীতির বিষয়ে সম্মক অবগতি লাভ করার চেষ্টা করবে। যাতে সহাবস্থানের পথ মসৃণ হয়। হিকমতের সাথে তাদেরকে কাছে টানা যায়। সহমর্মিতা লাভ করে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পথ সুগম হয়। হযরত জাফর (রা.) রাজদরবারে সুযোগ বুঝে সূরা মরিয়মের তেলাওয়াত–এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে। হযরত মরিয়ম ও ঈসা (আ.)-এর আলোচনা কোরআন থেকে শুনতে পেয়ে সেদিন অশ্রুসিক্ত হয়েছিল সকলের নয়ন। বিগলিত হয়েছিল পাষাণ হৃদয়।

১১. সংখ্যালঘু ভেবে মুসলমানদেরকে যদি কেউ উত্ত্যক্ত করে কিংবা কষ্ট দেয় তবে সবর করতে হবে, দু'আ করতে হবে এবং আল্লাহর সাহায্য লাভের অপেক্ষা করতে হবে। চরমপন্থা কিছুতেই অবলম্বন করা যাবে না। মুসলিম রমণীদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপের প্রেক্ষিতে আল্লাহর নুসরতের ঘটনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়।

১২. নিজেদেরকে আল্লাহর সাহায্য লাভের যোগ্য পাত্র হিসেবে তৈরি করা। তথা গোনাহমুক্ত জীবন গড়ে তোলা। গোনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করা।

সারকথা হলো, বর্তমান বিশ্বের যে সকল দেশের সরকার বা সংখ্যাগুরু জনগণ অমুসলিম এবং মুসলমানরা সেখানে সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করছে। হাবশার মুহাজির সাহাবাদের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারাও নিজেদের কর্মপন্থা ঠিক করতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় আইনের সহায়তা নিয়ে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারে।

বিদায় ফকীহুল মিল্লাত ভালো থাকবেন পরকালেও

মুফতি এনায়েতুল্লাহ

শহুরে জীবনে বাংলার চিরায়ত রূপবৈচিত্র্য ও আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অনেকেই অনভিজ্ঞ। নাড়ির টান গ্রামে হলেও নাগরিক জীবনের এটাই বাস্তবতা। তাই তো দেখা যায়, সামান্য হাঁটাহাঁটি বা রোদের তেজে ক্লান্ত হয়ে ওঠে শহুরেরা। একটু ছায়া খুঁজে এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি মারে। তবে এই শহরে তেমন ছায়াদ্বার গাছ আর কই?

কার্তিকের শেষ সময়ের সকাল। রোদ খুব একটা তেজোদীপ্ত নয়। তবুও দীর্ঘক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর। কিন্তু এখানে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন সারিবদ্ধভাবে। উদাস দৃষ্টি ঝাপসা করে দেওয়া চোখের পানিসমেত। মাইকের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। ক্ষণে ক্ষণে মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ! সকাল ১০টায়ই জানাযা শুরু হবে। ঘোষণা শুনে আরো নীরব হয়ে যায় বিশাল জনসমুদ্র।

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমানের জানাযার পরিবেশ ছিল এমনই। সংখ্যার বিচারে উপস্থিতির চেয়ে বরং রাস্তার চিত্রটা বলি। সকাল সোয়া ৭টা। ঢাকার প্রবেশদ্বার টঙ্গীবাজার বাসস্টেশন। টঙ্গী থেকে খিলক্ষেত-বসুন্ধরা হয়ে যে গাড়িগুলো নিয়মিত চলাচল করে এর কোনোটিতেই ওঠার উপায় নেই। অফিসগামী মানুষের সঙ্গে টুপি-পাঞ্জাবি পরা যাত্রীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। না বললেও বোঝা যায়, তাদের গন্তব্য বসুন্ধরা।

টঙ্গী হয়ে আবদুল্লাহপুর, হাউস বিল্ডিং, আজমপুর, রাজলক্ষ্মী, জসিমউদ্দিন, বিমানবন্দর, খিলক্ষেত, কুড়িল বিশ্বরোড পর্যন্ত প্রতিটি বাসস্টেশন হয়ে উঠেছিল লোকে লোকারণ্য। ঠিক একই চিত্র মিরপুর থেকে কুড়িল উড়াল সড়ক হয়ে ও রামপুরা দিয়ে বসুন্ধরা আসার রাস্তায়। সাতসকালে রাস্তায় বের হওয়া এই বিপুল জনতার গন্তব্যও যে হযরত মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (রহ.) কে বিদায় জানানো, সেটা ততক্ষণে নগরবাসী বুঝে গেছে।

আজ রাজধানীর সব পথ গিয়ে যেন মিলে গিয়েছিল বসুন্ধরা এলাকায়। কফিনবাহী গাড়িটি আসার আগেই জানাযাস্থল আলেম-উলামা ছাড়াও নানা পেশার লাখো মানুষের ভিড় জমতে শুরু করে। অশীতিপর প্রবীণ থেকে শুরু করে বাবার হাত ধরে আসা স্কুলপড়ুয়া শিশুটি–কে ছিল না! সবার বেদনামাখা মুখ। শোকে বিহ্বল সবাই। প্রিয় এই আলেমের জানাযায় অংশ নিতে দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন তাঁরা।

সংগত কারণে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় প্রবেশের সব রাস্তা লোকে লোকারণ্য। এত সকালে বসুন্ধরার আশপাশের অফিসগুলো ব্যস্ত হয়নি। দোকানিরা তাদের পসরা তখনো সাজায়নি। সাধারণত বসুন্ধরা এলাকার লোকজন মানুষের ভিড়ভাট্টা দেখতে খুব একটা অভ্যস্ত নন। তাঁরাও এই সকালে আগত মানুষের ওজুর ব্যবস্থা, অপরিচিতকে রাস্তা বলে দেওয়ার কাজ করেছেন নিজ উদ্যোগে।

বসুন্ধরা বড় মাদরাসা বা বসুন্ধরা কেন্দ্রীয় মসজিদ বলে খ্যাত ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (রহ.)-এর জানাযার কথা থাকলেও লোক সমাগমের ঢল দেখে কর্তৃপক্ষ বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারের সামনের রাস্তায় জানাযার ব্যবস্থা করে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মাইকও প্রস্তুত করা হয়। জানাযার আগে হযরত মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (রহ.)-এর মরদেহ হিমায়িত গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে।

দেশবরেণ্য এ শীর্ষ আলেমে দ্বীনের সম্মানে বুধবার (১১ নভেম্বর) ঢাকার সব মাদরাসার ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়। মাদরাসাগুলোতে তাঁর জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। ব্যবস্থা করা হয় পবিত্র কোরআন খতমেরও।

সকাল ১০টা ১০ মিনিটে জানাযার নামায শুরু হয়। জানাযার নামায পরিচালনা করেন মুফতী আরশাদ রহমানী। তিনি হযরত মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (রহ.) এর বড় ছেলে ও ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ও শায়খুল হাদীস।

জানাযার আগে দেশের বিশিষ্ট আলেমরা বক্তব্য রাখেন। হযরত মুফতী আবদুর রহমান সাহেব (রহ.) কর্মবহুল জীবন নিয়ে কথা বলেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিরপুর আরজাবাদ মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোস্তফা আজাদ, যাত্রাবাড়ী মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও মজলিশে দাওয়াতুল হকের আমির মাওলানা মাহমুদুল হাসান, সাবেক এমপি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নির্বাহী সভাপতি মুফতী ওয়াক্কাস, ইসলামী ঐক্যজোট চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী, গওহরডাঙ্গা মাদরাসার মহাপরিচালক ও খাদেমুল ইসলাম বাংলাদেশের আমির

মুফতী রুহুল আমিন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নতুন মহাসচিব মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী প্রমুখ।

জানাযাপূর্ব সময়ে আরো বক্তব্য রাখেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হক। এ সময় বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সাফিয়াত সোবহান ও বসুন্ধরা গ্রুপের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাফওয়ান সোবহান উপস্থিত ছিলেন।

জানাযাপূর্ব বক্তব্যের সময় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান। তাঁর কান্নার আওয়াজে উপস্থিত জনতাও কেঁদে উঠেন। ইট-পাথরের এ পাষাণ নগরে কান্নার রব বিরল হলেও আজ সাক্ষী হয়ে থাকল বসুন্ধরা। একেই বোধ হয় বলে স্বজন হারানোর ব্যথা!

মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে ইন্তেকাল করেন মুফতী আবদুর রহমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশের আলেম সমাজ থেকে শুরু করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাংলা ভাষাভাষীরাও এই শোকের মিছিলে শামিল হয়েছিল।

কবি বলেছেন, 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে? চিরস্থির কবে নীড় হায়রে জীবন নদে?' তবে সব নদী এক নয়, নদী-নদীতে পার্থক্য আছে, রয়েছে বৈচিত্র্যও। এই বৈচিত্র্যময়তার সাক্ষী হয়ে থাকল আজকের সকালটি।

মৃত্যু চিরন্তন। এটা নিয়ে অভিযোগ করার উপায় নেই। ইসলামও এটা সমর্থন করে না। তার পরও বলি, যারা দেশকে ভালোবাসেন, দেশের মানুষ, মাটি ও প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, যাঁরা সর্বদা মানবিক-মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলেন, যাঁরা সত্য-সৎ ও সুন্দরের অনুসারী, যাঁরা সৃষ্টিশীল কাজে সদা ব্যস্ত রাখতেন নিজেকে–কেন যেন এমন শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো বড্ড অসময়ে চলে যান আমাদের মাঝ থেকে। নিকট অতীতকালে আমরা এমন অনেক দিকপালতুল্য আলেমে দ্বীনকে হারিয়েছি। এ শূন্যতা কোনোভাবেই পূরণ হওয়ার নয়।

হযরত মুফতী আবদুর রহমান সাহেবের জানাযায় বিশাল উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে, নানা কর্মযজ্ঞ ও জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের বিশ্বাসী মুসলমান ও উলামায়ে কেরামের কাছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে কামনা করি, তিনি যেন পরকালেও এমন ভালোবাসা লাভ করেন।

লেখক : বিভাগীয় সম্পাদক, ইসলাম বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও
সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

নবী প্রেমের স্বরূপ

হাফেজ মুফতী রিদওয়ানুল কাদির

এ এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে প্রিয় নবী, দোজাহানের সর্দার তাজেদারে মদীনা, রহমাতুললিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে ভালোবাসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য অন্তঃকরণে লালন করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা ব্যতিরেকে ঈমান পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কল্পনা করাটাও বাতুলতা বৈ কিছু নয়। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে বিষয়টির প্রতি এভাবেই মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ : সুতরাং যেসব লোক তাঁর (মুহাম্মদ সা.) ওপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের (তথা আল-কোরআনের) অনুসরণ করেছে, যা তার ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে কেবলমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। (সূরা আল-আরাফ, আয়াত নং ১৫৭)

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

অর্থ : তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভালোবাসা তোমাদের অন্তরে স্বীয় সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও সমগ্র মানবজাতি অপেক্ষা বেশি না হবে। (বুখারী শরীফ, হা. নং ১৫, মুসলিম শরীফ ১/৪৯, নাসাঈ-৫০২৯)

এ থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে নবী প্রেমই হলো ঈমানের মূল। যার অন্তরে নবী প্রেম অনুপস্থিত, সে মূলত ঈমানের মূল বস্তুটি থেকেই বঞ্চিত। তাই কোনো ব্যক্তি মুমিন হবে, কিন্তু তার অন্তর অপরিমেয় নবী প্রেমে টইটম্বুর হবে না, তা বাস্তব অর্থেই অচিন্তনীয়।

সাহাবীদের অনির্বচনীয় নবী প্রেম :

স্মর্তব্য যে রাসূল (সা.)-এর প্রতি যে ভালোবাসা, মোহাব্বত বা ইশকের কথা বলা হয়, সেটি নিছক কোনো মৌখিক দাবি নয়, বরং এটি বাস্তবেই প্রমাণ করার বিষয়। সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিতের বাঁকে-বাঁকে হাজারো ঘটনা উম্মাহর জন্য শিক্ষণীয় হয়ে আছে হুববে রাসূল (সা.)-এর এক বর্ণিল অধ্যায়। ইতিহাস পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে এ কথারই সাক্ষ্য প্রদান করে যে প্রত্যেক সাহাবী নিজের জীবনে নবী প্রেমের এমন প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন, অনন্য নজির স্থাপন করেছেন, পুরো মানবেতিহাসে এ ধরনের ভালোবাসার দৃষ্টান্ত শুধু বিরলই নয়, বরং অসম্ভব। হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী (রা.) ছিলেন তৎকালীন আরবের খ্যাতিমান বুদ্ধিমান ও সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মক্কার কাফেররা তাঁকে মুসলমানদের সাথে সমঝোতার জন্য প্রেরণ করে। তিনি রাসূল (সা.)-এর দরবারে এসে সাহাবীদের নবী প্রেমের অভাবনীয় দৃশ্য দেখে মক্কার কাফেরদের সামনে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তার চুম্বকাংশ নিম্নরূপ। হে মক্কাবাসী! আল্লাহর কসম আমি বড় বড় রাজা-বাদশা দেখেছি। প্রবল ক্ষমতাবান সম্রাট তথা পারস্য ও রোম সম্রাট, আবিসিনিয়ার বাদশাহ, সব রাজদরবারে প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নিজ অনুসারী ও সহচরদের মাঝে মুহাম্মদের মতো অবিশ্বাস্য সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আমি কাউকে দেখিনি। মুহাম্মদের মুখ থেকে নির্গত থুথু অথবা কফ তাঁর কোনো সহচরের শরীরে পড়লে সে তা অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে নিজের পুরো শরীরে ও চেহারায় মালিশ করে নেয়। আর তিনি যদি তাদেরকে কোনো কাজের আদেশ করেন, তা পালনে তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা লেগে যায়। আমি সচক্ষে অবলোকন করেছি, তাঁর অনুসারীরা তাঁর ওজুর পানি মাটিতে পড়ার পূর্বেই বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। যদি তাঁর কোনো চুল বা লোম মাটিতে পড়ে, তারা তা তরিত গতিতে মাটি থেকে উঠিয়ে নেয়। তিনি যখন তাদেরকে উদ্দেশ করে কথা বলেন, তখন তাদের নিঃশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে যায়। আমি এ বিষয়ে আর কী বর্ণনা দেব বরং এ কথা বলা কোনোক্রমেই বাহুল্য কিংবা অত্যুক্তি হবে না যে মুহাম্মদের সীমাতিরিক্ত আজমত ও বড়ত্বের কারণে তাঁর সাথীরা তাঁর দিকে ভালো করে চোখ তুলে তাকাতেও সক্ষম হয় না। (বুখারী শরীফ-১/৩৭৯)

হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনায়িত এ ঘটনা এক দিন কিংবা দুই দিনের নয়, বরং এগুলো সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রাত্যহিক ঘটনা। নবী প্রেমের কণ্টকাকীর্ণ রাজপথে সাহাবায়ে কেরাম যে আত্মত্যাগ আর আত্মোৎসর্গের বিরল নজরানা পেশ করেছেন, তার সামনে লাইলি-মজনু আর শিরি-ফরহাদের কিংবদন্তি উপাখ্যানগুলোও লজ্জায় অবগুণ্ঠিত হয়ে যায়।

মানবতার নবী ও তাঁর শিক্ষাদানের

হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি :

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের মানসিকতাকে রাসূল (সা.) অনেক বেশি মূল্যায়ন করতেন। কিন্তু সাথে সাথে এদিকেও তাঁর সদা সতর্ক দৃষ্টি থাকত, উম্মতে মুহাম্মদিয়া যেন ভালোবাসার কুহেলিকায় আবদ্ধ হয়ে সত্য ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে না পড়ে এবং ভালোবাসার আতিশয্যে তারা যেন অন্ধকারের বন্ধুর পথে মুখ থুবড়ে না পড়ে। এ জন্য সাহাবীদের প্রতি তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল–তারা যেন স্বীয় নবীর স্তুতি-বন্দনায় অভিশপ্ত ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ন্যায় অতিরঞ্জন না করে। রাসূল (সা.)-এর বাণীটি এমন–

لاتطرونى كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله

অর্থ : তোমরা আমার প্রশস্তিগাথায় বাড়াবাড়ি করিও না। যেমনটি খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে। আমি আল্লাহর বান্দা বৈ কিছুই নই। হ্যাঁ, তোমরা এতটুকু বলো যে আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল। (বুখারী শরীফ-১০/৪৯০)

অন্য হাদীসে সাহাবীদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তারা যেন অন্য নবীর ওপর রাসূল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য এভাবে বর্ণনা না করে, যেভাবে বর্ণনা করলে বাহ্যত অন্য নবীকে হেয়প্রতিপন্ন করা বুঝে আসে। হাদীসের ভাষ্য এই–

لاتفضلوا بين انبياء الله

কোনো নবীকে অন্য কোনো নবীর ওপর শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করার জন্য তোমরা উঠে পড়ে লেগো না। (মুসলিম শরীফ-২/২৬৭)

উপরন্তু রাসূল (সা.) যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তিনি যে বিষয়ের প্রতি বারবার সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন এবং উম্মাহর দৃষ্টি যেদিকে নিবদ্ধ করেছিলেন তা হলো, তারা যেন রাসূল (সা.)-এর পবিত্র রওজাকে সিজদার স্থান বানিয়ে না ফেলে। আহলে কিতাবের বিষোদগারে বর্ণিত নবী করীম (সা.)-এর অবিস্মরণীয় বাণীটিও স্মরণ করা যেতে পারে,

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء هم مساجد

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক, তারা নিজেদের নবীদের কবরকে মসজিদ তথা সিজদা করার স্থান বানিয়ে নিয়েছিল। (বুখারী শরীফ-১/১৭৭)

উপরোক্ত দিকনির্দেশনা থেকে এ কথা দিবাকরের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে নবী প্রেমের কিছু সীমা-পরিসীমা ও আদব শিষ্টাচার রয়েছে। শুধুমাত্র লৌকিক ভালোবাসা প্রকাশ করা নিজের প্রবৃত্তির চাহিদানুপাতে হাপিত্যেশ করা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনর্থক ও মূল্যহীন। ভালোবাসার জন্য আনুগত্য পূর্বশর্ত। যে ভালোবাসায় আনুগত্য থাকবে না, তা মূলত ভালোবাসায় নই, বরং ভালোবাসার ছদ্মাবরণে নির্জলা মিথ্যাচার ও সন্দেহাতীত প্রতারণা। এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী (রহ.) (১৫০-২০৪ হি.)-এর একটি অনবদ্য কবিতা রয়েছে,

تعصى الا له وانت تظهر حبه
هذا لعمرى فى القياس بديع
لوكان حبك صادقا لاطعته
ان المحب لمن يحب يطيع

অর্থাৎ : তুমি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করছো, আবার তার ভালোবাসার দাবিও ব্যক্ত করছো! আমার প্রাণের শপথ! তোমার এ দাবিটি সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। তোমার ভালোবাসার দাবি যদি নির্জলা ও সত্য হতো, তবে তুমি অবশ্যই তার আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে। কারণ ধরার চিরন্তন নিয়ম হচ্ছে, প্রেমাস্পদের শর্তহীন আনুগত্যেই প্রেমিকের অশান্ত চিত্ত শান্ত ও পরিতৃপ্ত হয়। রাসূল (সা.) সর্বদা এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন যে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ভালোবাসা যেন তাদেরকে কোনো ধরনের ভ্রান্তিতে নিপতিত করতে না পারে। এ বিষয়ে একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য–একবার সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.)-এর ওজুর পানির জন্য কাড়াকাড়ি করছেন, তখন রাসূল (সা.) তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এই প্রতিযোগিতার হেতু কী? প্রত্যুত্তরে সাহাবীরা বললেন, আমাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বর্ণনাতীত ভালোবাসা। আর আমরা আপনার ওজুর পানি থেকে বরকত নিয়ে নিজেদের ভেতরের ভালোবাসারই মূলত বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছি। রাসূল (সা.) তাঁদের ভালোবাসার বাহ্যত জাঁকজমক, রং-চং ও লৌকিকতাতে বাস্তব ভালোবাসার দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য ইরশাদ করলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ، أَوْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا ائْتُمِنَ، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ "

অর্থ : যে ব্যক্তি এ কথার প্রত্যাশী হয় যে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে, অথবা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রেমাস্পদ হবে, সে যেন নিম্নোক্ত তিনটি কাজ গুরুত্বের সাথে করে– ১. সে যেন সর্বদা সত্য কথা বলে। ২. তার কাছে যখন কোনো জিনিস আমানত রাখা হয়, সে যেন ওই আমানত যথাযথভাবে আদায় করে দেয় এবং ৩. স্বীয় প্রতিবেশীর সাথে যেন সে ভালো ব্যবহার করে। (মিশকাত শরীফ,

২/৪২৪, শু'আবুল ঈমান ৬/২০১)
সুবহানাল্লাহ কতই না চমৎকার শিক্ষা! এমন শ্রেষ্ঠতম সুন্দরতম মানুষটির ছায়ায় থেকেই তো সাহাবায়ে কেরাম চরিত্রে ও নৈতিকতায় হয়ে উঠেছিলেন শক্তিমন্ত, বলবান ও অপরাজেয়। যুগের শ্রেষ্ঠ আলোকিত সন্তান।

আসুন একটু পর্যালোচনা করি :

প্রিয় পাঠক! আসুন রাসূল (সা.)-এর উপর্যুক্ত দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের মানসিকতাকে একটু নিরীক্ষণ করি। একটু গভীরভাবে চিন্তা করি, আমাদের নবী প্রেমের দাবিটি আনুগত্যের কষ্টি পাথরে উত্তীর্ণ কি না? না তা কেবল মুখের ফাঁপা বুলি? কারণ আনুগত্যহীন ভালোবাসা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণই অর্থহীন ও নিষ্ফল। এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে ইসলাম কোনো হুজুগে ধর্ম নয়! বরং ইসলামের মূল ভিত অনেক মজবুত ও শক্তিমন্ত! কেবল সাময়িক আবেগ-উত্তেজনা, খেল-তামাশা ও বাগাড়ম্বরতার নাম কখনো ইসলাম নয়। পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বস্ততার সাথে বলতে পারি, আমাদের অন্তরাত্মা মাহবুবে খোদা (সা.)-এর নিখাদ ভালোবাসা ও ইশকে টইটম্বুর। কিন্তু আমরা এটাও খুব ভালো করেই জানি যে ভালোবসার দাবিটি সর্বপ্রাণ হয়, যদি তার সাথে নিঃশর্ত আনুগত্য থাকে। ধরুন, কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে মুমিন পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রসাদে ভোগে, কিন্তু তার চেহারা, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, চলাফেরা–সব কিছুই সুন্নাতে নববীর পরিপন্থী বরং সে এগুলোতে রাসূল (সা.)-এর আজন্ম শত্রুদের অনুসরণেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তাহলে সে যতই ভালোবাসার নামে লাফালাফি-দাপাদাপি ও লম্ফঝম্ফ করুক না কেন, তার এই দাবি ইনসাফ ও নিরপেক্ষতার বিচারে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে যদি কেউ ভালোবাসার দাবি করতে করতে মুখ থেকে ফেনাও বের হয়, কিন্তু নামায-রোযাসহ অন্যান্য ইবাদত থেকে সে যোজন-যোজন দূরে, এ ধরনের মোহাব্বত ও ভালোবাসা তার কোনো উপকার সাধনে সমর্থ হবে না। স্মরণ রাখতে হবে! ভালোবাসার লাল গোলাপটি নিঃস্বার্থ আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতিরেকে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হয় না।

এগুলোই কি রাসূলের ভলোবাসা!

এখন আরবী বছরের তৃতীয় মাস পবিত্র রবিউল আউয়াল অতিবাহিত হচ্ছে। এ মাস বড় বরকতময়। বড় পবিত্র। এ মাসেই ধরিত্রীকে খুশির সাগরে ভাসিয়ে বসুন্ধরায় তাশরীফ নিয়ে এসেছিলেন প্রিয় নবী (সা.)। তবে এ মাসের কোন তারিখে রাসূল (সা.) ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, তা নিয়ে ইতিহাসবেত্তাদের মাঝে প্রচুর মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণের মাঝে রাসূলের জন্ম তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল অধিক প্রসিদ্ধ হলেও বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মতে, রাসূলের জন্ম তারিখ ৯ রবিউল আউয়াল হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত ও বিশুদ্ধ। বড় দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমরা আমাদের কর্মগত দুর্বলতাকে চাপা দেওয়ার জন্য ওই মোবারক দিনকে কেন্দ্র করে রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসার লেবেল এঁটে যেসব গর্হিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছি, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। রবিউল আউয়াল আসলেই এক শ্রেণির মানুষের মাঝে নবী প্রেমের ঢেউ স্ফীত হয়। চতুর্দিকে হিড়িক চলে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবীর। ওই সব অনুষ্ঠানের সূচি মোটামুটি এ রকম : নাচ-গান বাজে, কাওয়ালি বাজে, ব্যান্ড সংগীত বাজে, তথাকথিত নাত বাজে, ঝুমুর পার্টি বাজে, তবারুক বিতরণ---------- --- বাজে। (নাউজুবিল্লাহ!) আমরা কত নিচে নেমে গেছি! রাসূল (সা.)-এর জন্মের আনন্দে মীলাদুন্নবীর নামে ব্যান্ড পার্টি দিচ্ছি, পোস্টারে-ব্যানারে শহর ছেয়ে ফেলছি, মানুষকে সেখানে অংশগ্রহণ করানোর জন্য কত নিত্যনতুন ফন্দি-ফিকিরে ব্যস্ত আছি। এ ধরনের ঈমানবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের ওপর শুধুমাত্র ইন্নালিল্লাহ পড়ে ক্ষান্ত হলেই চলবে না। বরং সমাজের বিদ্বান ও বিশুদ্ধ আক্বিদার অনুসারীদের ওপর এ গুরু দায়িত্বও বর্তায় যে তারা স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী ওই সমস্ত কুসংস্কার ও গর্হিত কাজকে সমাজ থেকে মূলোৎপাটনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালাবে, রাসূল (সা.)-এর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যেগুলোর শিকড় আমাদের সমাজের অনেক গভীরে প্রোথিত। কতই না পরিতাপের বিষয়, অনেক অজ্ঞ লোক রাসূল (সা.)-কেই উপলক্ষ বানিয়ে উম্মাহর মাঝে অনৈক্য আর বিভেদের প্রাচীর দাঁড় করাচ্ছে। (নাউজুবিল্লাহ) তারা এই দাবিও সদম্ভে ঘোষণা করে যে অমুক পার্টি রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসার ক্ষেত্রে অগ্রগামী। অমুক দলের অনুসারীরা রাসূল (সা.)-কে কম ভালোবাসে! অথচ মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত ও দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত হলো এই যে রাসূল (সা.) তাঁর সমস্ত গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যে একক ও অদ্বিতীয়। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যে কেউ তাঁর সাথে অংশীদার নেই। আরশ, কুরসী, কাবা, সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। আর রাসূলে আকরাম (সা.) আশরাফুল মাখলুকাত তথা সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মহামানব। কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা অথবা কোনো নবী-রাসূল সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে রাসূলের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না, বরং তারা রাসূলের সমকক্ষও হতে পারবে না।

রাসূল (সা.) সম্মানের দিক দিয়ে কেবল উম্মতের নবী নন, বরং নবীয়ুল আম্বিয়া তথা নবীদের নবী। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিই আমাদের দাবির সপক্ষে জোরালো প্রমাণ,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

অর্থ : আর আল্লাহ তা'আলা যখন সকল নবীর কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি–কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোনো রাসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেওয়ার জন্য, তখন সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করে নিয়েছো? প্রত্যুত্তরে তারা বলল, আমরা অঙ্গীকার করেছি। তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাকো। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৮১) যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই জানতেন যে রাসূল (সা.) ধরাপৃষ্ঠে সব নবী-রাসূলের পরেই তাশরীফ নিয়ে আসবেন। এ জন্য রাসূল (সা.)-এর যুগে যদি কোনো নবীর আবির্ভাব না ঘটত, তাহলে এই আয়াতের মর্মার্থ সুস্পষ্ট হতো না। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-কে সশরীরে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নিলেন এবং কিয়ামতের পূর্বে তাঁকে আবার পৃথিবীতে পাঠানো হবে। হযরত ঈসা (আ.)-কে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া এবং আবার পৃথিবীতে পাঠানোর অনেক ব্যাখ্যা ও কারণ বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম একটি কারণ এটাও যে একজন নবী রাসূল (সা.)-এর যুগে আবির্ভূত হবেন এবং রাসূল (সা.)-এর ওপর ঈমান নিয়ে আসবেন। যেন সবার সামনে দিবাকরের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে যায় যে রাসূল (সা.) কেবল উম্মতের নবী নন, বরং তিনি নবীয়ুল আম্বিয়া তথা, নবীদেরও নবী। যেহেতু তাঁর ওপর নবীরাও ঈমান আনয়ন করেছেন। এ জন্যই হযরত ঈসা (আ.)-কে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে পাঠানো হবে। হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণের পুরো ঘটনা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) দামেশক শহরের জামে মসজিদের মিনারার ওপর অবতরণ করবেন। তাঁর মাথা থেকে তখন গোসলের পানি টপকে টপকে মাটিতে পড়বে। তখন সময় হবে বিকেলবেলা। আসরের নামাযের ইকামত দেওয়া হবে। তখন আচমকা ইমাম মাহদীর দৃষ্টি হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর পড়তেই তিনি বলবেন, تقدم يا روح الله . হে আল্লাহর নবী! আমাদেরকে নামায পড়িয়ে দিন। প্রত্যুত্তরে হযরত ঈসা (আ.) বলবেন, আমি যদি ধরাপৃষ্ঠে আগমন করা মাত্রই নামাযের ইমামতি করি, তাহলে লোকেরা মনে করবে, আমি নবী হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেছি। অথচ বাস্তবতা হলো, আমি নবী হিসেবে নয়, বরং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একজন সাধারণ উম্মত হিসেবেই পৃথিবীতে আগমন করেছি। অতঃপর মাহদী (আ.) নামাযের ইমামতি করবেন এবং হযরত ঈসা (আ.) তাঁর পেছনে নামায আদায় করবেন। রাসূলের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব, পূর্ণতা, প্রকৃষ্টতা, অনবদ্যতা কোন স্তরের ছিল? এর চমৎকার বর্ণনায়ন অনিন্দ্যসুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে খাতেমুল মুহাদ্দেসীন আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মেরী (রাহ.) (মৃ. ১৩৫২ হি.)-এর ভাষায়। তিনি বলেছেন, রাসূল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব সমুদ্রের অজস্র জলরাশি, মরুভূমির অগুনতি ধূলিকণা, আকাশের দেদার তারকারাজির চেয়েও হাজার-হাজার গুণ বেশি। আসল কথা হলো, সৃষ্টি জগতের পক্ষে রাসূল (সা.)-এর পূর্ণতার বর্ণনায়ন কিংবা তা গণনা করা সম্ভব নয়। (ফয়জুল বারী) হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) (১২৮০-১৩৬২ হি.) এ সম্পর্কে আরো তাৎপর্যময় মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, উম্মতের ওপর রাসূল (সা.)-এর তিনটি প্রাপ্য অধিকার রয়েছে। ১. حق عظمت তথা সম্মানের অধিকার , ২. حق محبت তথা ভালোবাসার অধিকার ও ৩. حق اطاعت তথা আনুগত্যের অধিকার। উপর্যুক্ত কথার সারাংশ হলো এই, রাসূল (সা.) যেমন সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী তথা রাসূলের মতো সম্মানী কেউ না অতীতে পৃথিবীতে এসেছিল, তদ্রূপ না কিয়ামত পর্যন্ত আসবে, তদ্রূপ রাসূল (সা.)-এর চেয়ে কেউ অধিক ভালোবাসার পাত্র হতে পারবে না। রাসূলের সম্মান ও ভালোবাসার চাহিদা হলো, তাঁর আদেশ-নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা এবং নিঃশর্ত পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা। কারণ যার মধ্যে যত বেশি পূর্ণতার গুণাগুণ বিদ্যমান থাকে, তাকে তত বেশি ভালোবাসা যায়, আর ভালোবাসার পূর্বশর্তই হলো নিঃশর্ত আনুগত্য। পাঠক! উপর্যুক্ত আলোচনার

প্রেক্ষিতে আমরা যদি আমাদের কর্মকাণ্ডের একটু পর্যালোচনা করি যে রাসূলের ভালোবাসা আমাদেরকে কতটুকু তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে? আমাদের কাজকর্মে যদি রাসূলের আনুগত্যের বিষয়টি ফুটে না ওঠে, তাহলে ভালোবাসার দাবিটি কেবলই অর্থহীন মুখের বুলি হিসেবে বিবেচিত হবে। বরং আনুগত্য না করার অর্থই হচ্ছে, রাসূলকে সম্মানও না করা। এ কথা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে রাসূল (সা.)-এর উম্মত হতে পারাটা মস্তবড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। হযরত বদর আলম মীরঠী (রহ.) একবার মদীনা শরীফে ওয়াজ করার সময় বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে (পরবর্তী উম্মতকে) এমন একটি অনন্য আংশিক সম্মানে ভূষিত করেছেন, যেটা সাহাবায়ে কেরামকেও দান করেননি। অতঃপর তিনি মুসনাদে আহমদের নিম্নোক্ত হাদীসটি পড়ে শোনালেন,

عن ابى هريرةؓ ان رسول الله ﷺ وددت انى قد رأيت اخواننا قالوا يا رسول الله! السنا اخوانك ؟ قال بل انتم اصحابى ولكن اخوانى الذين آمنوا ولم يرونى-

অর্থাৎ : রাসূল (সা.) একবার আশা প্রকাশ করলেন, আহ! আমি যদি আমার ভাইদেরকে দেখতে পেতাম! তখন সাহাবীরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? প্রত্যুত্তরে রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আমার ভাই হলো ওরা, যারা আমাকে না দেখেই আমার ওপর ঈমান আনবে এবং আমাকে ভালোবাসবে। (মুসনাদে আহমদ, শু'আইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন) সুবহানাল্লাহ! আমাদের জন্য রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে কত বড় সুসংবাদ! এখন আমাদের দায়িত্ব হলো, রাসূল (সা.)-এর এই ঘোষণার লাজ রক্ষা করা।

এত দুঃখ কোথায় রাখি?

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আনুগত্য ব্যতিরেকে ভালোবাসা অর্থহীন। কিন্তু বর্তমানে ভালোবাসার দাবিদারের অভাব না থাকলেও তাদের মাঝে রাসূলের আনুগত্যের ছিটেফোঁটাও পরিলক্ষিত হয় না। করেছে নিজেদের প্রবৃত্তি পূজা, কিন্তু সেটাকেই জ্ঞান করছে রাসূলকে ভালোবাসার মাপকাঠি। এর চেয়েও বড় দুঃখের কথা এই যে সমাজের যেসব লোক তাদের ওই সব মনগড়া কথা অস্বীকার করে থাকতে চায়, উল্টো তাদেরকেই রাসূলের দুশমনের লেবেল এঁটে দেওয়া হয়। রাসূলের ওই সব কপট প্রেমিকরা আরো কী করে দেখুন! তাদের স্বার্থে যেন সামান্যতমও আঁচড় না লাগে, সেজন্য হক্বপন্থী আলেম-উলামাদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে জনসাধারণকে তাঁদের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। উলামাদের বিরুদ্ধে এসব সুবিধাবাদী প্রেমিকের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র পূর্বে যেমন ছিল, এখনো এসব থেমে নেই। অথচ বর্তমানে উম্মাহর মহাক্রান্তিকাল চলছে। এখন তাদের পরস্পরে সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ থাকা চাই। শাখাগত মতানৈক্যকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে মুসলমানদেরকে একই কাতারে নিয়ে আসাটাই বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অথচ কিছু অভাগা উম্মাহর এই নাজুকতম মূহূর্তেও কেবল নিজেদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে সুসংহত করার হীন মানসে নির্লজ্জ-বেহায়ার মতো হকপন্থী উলামায়ে কেরামকে কাফের সাব্যস্ত করতে অহর্নিশি আদাজল খেয়ে নেমেছে। আমরা তাদের জন্য শুধু এটুকুই দু'আ করতে পারি, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করুন এবং তাদের অনিষ্টতা থেকে উম্মাহকে হেফাজত করুন! আমীন।

উলামায়ে দেওবন্দের ওপর কত বড় অপবাদ!

এসব অদূরদর্শী, নবী প্রেমিকরা (?) সবচেয়ে মারাত্মক অপবাদ আরোপ করে থাকে উলামায়ে দেওবন্দের ওপর। তারা নানা ফন্দি-ফিকির করে সরলমনা মুসলমানদের অন্তরে এই মিথ্যা ধারণাটি বদ্ধমূল করে দিচ্ছে যে উলামায়ে দেওবন্দ (নাউজুবিল্লাহ) প্রিয় নবী (সা.)-কে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেন না। তারা নবীজির পবিত্র শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী। বাস্তব সত্য হলো, পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে বড় অপবাদ আর নির্জলা মিথ্যাচার হতেই পারে না। উলামায়ে দেওবন্দ রাসূলের সাচ্চা আশেক। তাঁরা রাসূলের শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শকারী হতেই পারেন না। আসল প্রগলভ ও স্পর্ধিত তো তারাই, যারা এসব নিষ্ঠাবান, খাঁটি আশেকে রাসূল উলামায়ে দেওবন্দকে রাসূলের দুশমন প্রমাণ করার টেন্ডার নিয়ে নিজেদের আমলনামাকে নিজেরাই ভাগাড় বানাচ্ছে। উলামায়ে দেওবন্দ যে খাঁটি আশেকে রাসূল এ কথার ওপর স্বতন্ত্র দলিল-দস্তাবেজ উপস্থাপন করার কোনো প্রয়োজন নেই। উপমহাদেশের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁদের সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং অকৃত্রিমতার রাজসাক্ষী। উপমহাদেশের মাটিতে প্রিয় নবীজির মৃতপ্রায় সুন্নাতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার একমাত্র ক্রেডিট ও কৃতিত্ব উলামায়ে দেওবন্দেরই। তাঁদের উদয়াস্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অত্র অঞ্চল থেকে কুফর-শিরক এবং বিদ'আতের

মূলোৎপাটন হয়েছে। বিদূরিত হয়েছে যত অন্ধকার! বিকশিত হয়েছে হেদায়েতের আলো। দিকে দিকে গড়ে উঠেছে অসংখ্য আলোর ফোয়ারা! মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। আচ্ছা বলুন তো, উপমহাদেশে দ্বীন রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব আল্লাহ কাদের দ্বারা আঞ্জাম দিচ্ছেন? রাফেজীদের স্বরূপ উন্মোচনকারী কারা? কাদিয়ানীদের অপ্রতিহত শৌর্য-বীর্যকে ধূলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছে কারা? বিদ'আত-আর কুসংস্কারের ভিড়ে কাদের কণ্ঠে উচ্চকিত হয়েছে সুন্নাতের নারা (স্লোগান)? শিরকের বিষাক্ত পরিবেশেও কারা ঊর্ধ্বাকাশে তুলে ধরেছে লা ইলাহা ইল্লাহর ঝাণ্ডা? কথিত আহলে হাদীসদের ঘৃণ্য মিশন সম্পর্কে উম্মাহকে সচেতন করতে কারা রাত-দিন একাকার করে ফেলছেন? উপমহাদেশের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে ন্যূনতম ও জ্ঞানধারী ব্যক্তি চোখ বন্ধ করেই বলে দিতে পারবেন, সব প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, উলামায়ে দেওবন্দই উপর্যুক্ত সব গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। এবং ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠা এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাবেন। শুধু একটি ঘটনা শোনাচ্ছি।

মোরা একটি সুন্নাতকে বাঁচাব বলে :

সুন্নাত চর্চার বিশুদ্ধ প্রাণকেন্দ্র বিশ্বখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসেম নানুতভী (রহ.) (১২৪৭-১২৯৭) ছিলেন একজন সাচ্চা আশেকে রাসূল। সাথে সাথে তিনি ছিলেন ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের মহান পুরোধা। ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে পুরো ভারতবর্ষ যখন টালমাটাল, তখন তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ইংরেজ সরকার। ফলে তিনি তিন দিন আত্মগোপন করে থাকেন। তিন দিন পর তিনি পুনরায় জনসম্মুখে চলে আসেন। সাথীরা তাঁকে পুনরায় আত্মগোপনে চলে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করলে তিনি বলেন, আমার প্রিয় হাবীব (সা.) ছওর পর্বতে তিন দিন আত্মগোপন করে ছিলেন। আমি তো আত্মগোপন করেছি এই সুন্নাতের ওপর আমল করার জন্য। বিধায় তিন দিনের অধিক আত্মগোপন করে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহু আকবর! এঁরা নাকি রাসূলের দুশমন! ইন্নালিল্লাহ! পরিশেষে আসুন কোরআন-হাদীস কর্তৃক নির্দেশিত পথে রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসি। রাসূল (সা.)-এর প্রতিটি সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর মর্জি অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন। আমীন!

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)-এর
সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

মাও. রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

উমহাদেশের শীর্ষ মুরব্বি মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশসহ অগণিত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক এবং অভিভাবক, ফকীহুল মিল্লাত, শায়খুল হাদীস ফিল আরবি ওয়াল আজম হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (রহ.) ১৯২২ ইং মোতাবেক ১৩৪০হি: সনে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ইমামনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম চাঁদ মিয়া (রহ.)।

প্রখর মেধা ও ধীশক্তিবলে অত্যন্ত ছোটবেলায় তিনি নাজিরহাট বড় মাদরাসা ও জামিআ আহলিয়া মঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন এবং ১৯৫০ সালে সমাপনী বর্ষ তথা দাওরায়ে হাদীস কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। দারুল উলূম দেওবন্দে ১৯৫১ সালে সর্বপ্রথম উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ তথা উফতা বিভাগের সূচনা করা হয়। দাওরায়ে হাদীস পাস করার পর তিনি উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণার জন্য উক্ত বিভাগে ভর্তি হয়ে কোর্স সমাপ্ত করে দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বপ্রথম মুফতী সনদ গ্রহণ করেন। তৎকালে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী ছিলেন মুফতী মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী (রহ.)। সহকারী মুফতী ছিলেন মুফতী আহমদ আলী সাঈদ (রহ.)। এক সময় সহকারী মুফতী সাহেব (রহ.) দীর্ঘ ছুটিতে গেলে দারুল উলূম কর্তৃপক্ষ হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)কে খণ্ডকালীন সহকারী মুফতীর দায়িত্ব প্রদান করেন। এই দায়িত্বের জন্য তিনি সম্মানী ভাতাও পেতেন। একই প্রতিষ্ঠানে ফুনুনাতে আলিয়ার কোর্সওসমাপ্ত করেন তিনি।

দারুল উলূম দেওবন্দে থাকাকালীন তিনি সাহারানপুর মাদরাসায় হযরত শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (রহ.)-এর সান্নিধ্যে গিয়ে তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হতেন। এক সময় হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) নিজ সন্তান হযরত মাওলানা তালহা সাহেব দা.বা. ও হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব দুজনকে একসাথে স্বতন্ত্রভাবে জিকিরের হলকায় বসাতেন। তা থেকে তাঁর সাথে হযরত শায়খুল হাদীস সাহেব (রহ.)-এর সাথে প্রগাঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা এক প্রকার পারিবারিক সম্পর্কের মতো জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রারম্ভ হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর হাতে হলেও তিনি পরবর্তীতে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর সর্বশেষ খলীফা মুহিউসসুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব সাহেব হারদূয়ী (রহ.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণকরত আধ্যাত্মিক শিক্ষায় পূর্ণতা লাভ করে খেলাফতপ্রাপ্ত হন। খেলাফত লাভের পর থেকে তিনি সলূক ও আত্মশুদ্ধির পথে দেশব্যাপী অবদান রেখে গেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন খানেকায়ে এমদাদিয়া আশরাফিয়া আবরারিয়া। যেখান থেকে আধ্যাত্মিক পথে উপকৃত হতে চলেছেন দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরাম থেকে শুরু করে ছাত্র ও সাধারণ মুসলমানগণ।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত মুফতী আযীযুল হক্ব (রহ.)-এর আহ্বানে তিনি জামিয়া পটিয়ায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এতে তিনি হাদীস, তাফসীর ও অন্যান্য ফুনুনের বিভিন্ন জটিল কিতাবাদীর পাঠ দান করেন।

একসময় দেশের বিশালায়তন উত্তরাঞ্চল তথা উত্তরবঙ্গে দ্বীনি শিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। তেমনি এক সন্ধিক্ষণে উত্তরবঙ্গের কিছু দ্বীনদরদী লোক জামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হযরত মুফতী আযীযুল হক সাহেব (রহ.)-এর কাছে এসে একজন সুযোগ্য কর্মঠ আলেম উত্তরবঙ্গে পাঠানোর জন্য আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে তিনি হযরত মুফতী আবদুর রহমান সাহেবকে (রহ.) উত্তরবঙ্গে প্রেরণ করেন। ১৯৬০ ইং সালে তিনি উত্তরবঙ্গ গমন করে ওয়াজ-নসীহত, শিক্ষা-দীক্ষা এবং উন্নত আদর্শ ও আপন যোগ্যতাবলে পুরো উত্তরবঙ্গে দ্বীনি আদর্শের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হন। সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি মসজিদ, মাদরাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরবঙ্গের মানুষকে দ্বীনি জযবা চেতনায় উজ্জীবিত করেন। (উল্লেখ্য, তিনি সে সময় উত্তরবঙ্গে গেলেও জামিয়া পটিয়ায় তাঁর নামে

কিতাবাদী অব্যাহত ছিল এবং মাঝেমধ্যে পটিয়া এলে তিনি নিয়মিত দরস প্রদান করতেন)। সে সময় তিনি উত্তরবঙ্গে অবস্থিত বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কওমী মাদরাসা জামিয়া ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম (জামীল মাদরাসা) বগুড়ার দায়িত্ব পালন করেন। মূলত তাঁর হাতেই বগুড়া জামীল মাদরাসার গড়ে উঠা এবং বেড়ে উঠা।

উত্তরবঙ্গে দীর্ঘ ৮ বছরের সফল মিশন শেষে তিনি আল-জামিয়া পটিয়ায় চলে আসেন। তথায় ১৯৯০ ইং সাল পর্যন্ত পুরোদমে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহের শিক্ষাদানের পাশাপাশি জামিয়ার শিক্ষা বিভাগীয় পরিচালক, সহকারী মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এ বছরগুলোতে তিনি অত্র জামিয়ায় বুখারী শরীফ প্রথ খণ্ডেরও পাঠদান করেন। বর্তমানে আল-জামিয়া পটিয়া বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেওয়ার পেছনে হযরত হাজী ইউনুস সাহেব (রহ)-এর পাশাপাশি তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেহনত অনস্বীকার্য।

তিনি ১৯৯০ ইং সালে আল-জামিয়া পটিয়া থেকে চলে গিয়ে দেশ-বিদেশের বরেণ্য আলেম-উলামা ও মুরব্বিদের পরামর্শে ১৯৯১ ইং সালে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন, যা কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়ে উপমহাদেশের একটি নামকরা ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের রূপ নেয়। ২০০৪ ইং সালে ঢাকার কেরানীগঞ্জে বসুন্ধরা রিভারভিউতে জামিআতুল আবরার নামে আরেকটি দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন, যা ২০০৭ সাল পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ দাওরায়ে হাদীস মাদরাসায় রূপ নেয়।

তিনি আল-জামিআ পটিয়া থাকা অবস্থায় থেকে ইসলামী ব্যাংকিংব্যস্থা নিয়ে গবেষণা করেন। তখন থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী ফাইন্যান্সের ওপর তাঁর লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়। সেই থেকে তাঁর একটি প্রচেষ্টা ছিল যে দুনিয়াব্যাপী সুদভিত্তিক অর্থনীতির স্থলে কিভাবে সুদবিহীন ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তন করা যায়। এ ক্ষেত্রে তিনি দেখলেন যে বাংলাদেশে আশাব্যাঞ্জক ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থা চালু থাকলেও ইসলামী অর্থনীতির ওপর নিয়মিত লেখাপড়া ও গবেষণা না থাকায় সমাজে ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তন একটি দুরূহ বিষয়। আর এ ক্ষেত্রে আলেম-উলামার ব্যাপক জ্ঞান চর্চিত না হলে ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থাও নামেমাত্র থাকবে। সে কারণে তিনি শুধু কওমী মাদরাসার ফারেগীনের জন্য ২০০২ ইং সালে ইসলামী অর্থনীতির ওপর একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করে নিজ প্রতিষ্ঠিত উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরাতে। ২০০৯ সালে তিনি ইসলামিক ফাইন্যান্সের ওপর একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম রাখা হয় "সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিকস বাংলাদেশ"। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী অর্থনীতির উচ্চ গবেষণার ক্ষেত্রে সারা দেশে একক ও অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবদান রেখে যাচ্ছে। এ ছাড়া তিনি ঢাকায় মদীনাতুল উলূম মাদরাসা বসুন্ধরা এবং আশরাফিয়া মাদরাসা গাজীপুর নামে আরো দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সব মিলিয়ে ঢাকাতেই তাঁর সরাসরি পরিচালনাধীন মাদরাসা ৫টি। তিনি চট্টগ্রাম শহরের ঐতিহ্যবাহী শুলকবহর মাদরাসা এবং উত্তরবঙ্গের বগুড়া জামীল মাদরাসারও সরাসরি পরিচালক ছিলেন। এ ছাড়া দেশের শত শত মাদরাসার উপদেষ্টা ও মুরব্বি হিসেবেও তিনি কল্পনাতীত খেদমাত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের মুরব্বিগণের মধ্যে মসজিদে নববীতে বসে আরব ছাত্রদেরকে হাদীসের দরস দেওয়ার ঘটনা বিরল। তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যিনি প্রতিবছর রমাজান মাসে মসজিদে নববীতে আরব ছাত্রদেরকে হাদীসের কিতাবাদীর দরস দিতেন। সে কারণে কেউ কেউ তাঁর নাম দিয়েছেন শায়খুল হাদীস ফিল আরব ওয়াল আজম। দীর্ঘকাল থেকে তিনি বার্ষিক তিনবার মক্কা-মদীনা যিয়ারত করতেন। তিনি অন্তিম শয্যায়ও যে আকাঙ্ক্ষাটি দেখাতেন তাহলো মক্কা-মদীনার যিয়ারত। দীর্ঘ ৬ মাস শয্যাশায়ী অবস্থায় সামান্য শক্তি পেলেই বলতেন আমার জন্য তাড়াতাড়ি ভিসা ইত্যাদির ব্যস্থা করো। আমি মক্কা-মদীনা ঘুরে আসি। এমনকি যখন তিনি আইসিউতে ছিলেন তখনও তাঁর ছেলেদের এ ব্যাপারে খুব পীড়াপীড়ি করতেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তানরাও ব্যবস্থাগুলো করে রেখেছিলেন। যাতে সামান্য শক্তি ফিরে পেলেই হুজুরকে যেন মক্কায় নিয়ে যাওয়া যায়। তাঁর কাছে হাদীসের দরস নেওয়া আরব ছাত্রদের মাঝে উস্তাদের প্রতি কী পরিমাণ মুহাব্বত ও শ্রদ্ধা ছিল তা অনুমান করা যায় যখন তাদের কেউ কেউ তাঁর দীর্ঘ অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখতে আসে।

তিনি দেশের বেশ কয়েকটি ইসলামী

ব্যাংকের শরীয়াহ সুপারভাইজারী কমিটির সভাপতি এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের সর্বোচ্চ শরীয়াহ কাউন্সিল "সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড"-এরও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলাদেশের কওমী মাদরাসাসমূহ বেশ কয়েকটি বোর্ডের অধীনে নিয়ন্ত্রিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বোর্ড হলো পাঁচটি। ঢাকাতে বেফাকুল মাদারিস বাংলাদেশ, চট্টগ্রামে ইত্তেহাদুল মাদারিস বাংলাদেশ, সিলেটে আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালীম বাংলাদেশ, উত্তরবঙ্গে তানযীমুল মাদারিস বাংলাদেশ এবং দক্ষিণবঙ্গে গৌহারডাঙ্গা মাদরাসাভিত্তিক বেফাকুল মাদারিস। এর মধ্যে পরের চারটি বোর্ড নিয়ে গঠিত কওমী মাদরাসাসমূহের সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডেরও তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উত্তরবঙ্গ তানযীমের তিনি সরাসরি চেয়ারম্যান ছিলেন।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) সমাজের প্রতিটি স্তরে সুন্নাতে রাসূল অনুযায়ী জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতেন। বিশেষ করে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যেন সুন্নাতে নববীর আলোতে সুসজ্জিত হয় সেই চেষ্টায় ও সেই চিন্তায় সব সময় তিনি বিভোর থাকতেন। নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাহফিল, সভা, বৈঠক করে মুসলমানদেরকে এবং আলেম-উলামাকে সুন্নাতের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সুন্নাতী বিয়ে, সুন্নাতী লেবাস, সুন্নাতী আহার-বিহার, সুন্নাতী লেনদেন, আযান, ইকামত, নামায–সব কিছুই যেন রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হয়, ইত্যাদির বাস্তবায়ন তাঁর একটি দৈনন্দিন মিশন হিসেবেই পরিগণিত। এ মিশন বাস্তবায়নে তিনি শয্যাশায়ী হওয়ার আগ পর্যন্ত দূর-দূরান্তে সফর করতে কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ করেননি। সারা দেশে ইসলামী সম্মেলন করার যে জযবা ও বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় বলতে গেলে এর সফল সূচনা হয় তাঁর হাতেই।

এহয়ায়ে সুন্নাতের কাজ সারা দেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশ' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন তিনি। এর অধীনে দেশের অধিকাংশ বড় শহরগুলোতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক বাণী আপামর জনসাধারণের সামনে পৌছে দেওয়ার ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন। একই সাথে এই সম্মেলনের মাধ্যমে আকাবিরে দেওবন্দের ভাবমূর্তী ও আদর্শ বিকশিত ও বিস্তৃত হয়েছে সারা দেশে।

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নামে তাঁর একটি সেবামূলক সংস্থা রয়েছে। অত্র সংস্থার মাধ্যমে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, হেফযখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া তিনি উক্ত সংস্থার মাধ্যমে দেশের গরিব, মিসকীন, এতিম ছাত্রদের আহার-বিহার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। অভাবী আলেম-উলামাদের প্রতিও তাঁর দানহস্ত সমভাবে প্রসারিত ছিল। মুসলমানদের বিভিন্ন আপদ-বিপদ ও দুর্যোগে তাদের পাশে থাকতে চেষ্টা করতেন। তাঁর সধ্যানুসারে যখন যা থাকে, তা নিয়েই বিপদে জর্জরিত জনসাধারণের কাছে দৌড়ে যেতেন। দেশের প্রায় দুর্যোগকবলিত এলাকা এর বাস্তব সাক্ষী। পূর্ব থেকে চলে আসা তাঁর এসব সেবামূলক কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন নামে ওই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁর সেবামূলক কার্যক্রম আরো সুবিন্যস্ত ও ব্যাপক হয়।

ইসলামের সঠিক আক্বিদা, আহকাম ও বাণী প্রচার এবং ইসলামের নামে বিভিন্ন বাতিল সম্প্রদায় সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে ব্যাপকভাবে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১২ ইং সালে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন। যার নামকরণ করা হয় তাঁর শায়খ হযরত শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.)-এর নামে 'মাসিক আল-আবরার'। খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে এই সাময়িকীটি অকল্পনীয় সাড়া পায়। সমাদৃত হয় পুরো দুনিয়ার বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে।

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ১০/১১/২০১৫ ইং মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে এই মহান ব্যক্তিত্ব বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে জান্নাতবাসী হয়ে যান। পরের দিন ১১/১১/২০১৫ বুধবার সকাল ১০টায় বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে তাঁর ঐতিহাসিক নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর জানাযার নামাযে ছিল লাখো মুসলমানের উপস্থিতি।

ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল (হিজরী সন হিসেবে) ৯৬ বছর। তিনি দুই ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য ছাত্র, মুরিদান, খলীফা ও ভক্ত রেখে যান। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে উচ্চ স্থান নসীব করুন। আমীন। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও ভক্ত-অনুরক্তদের সবরে জমীল ধারণের তাওফীক দান করুন এবং তাঁর যাবতীয় কার্যক্রম ও তাঁর রূহানী ফুয়ুজ কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখুন। আমীন।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : বিতির নামায

মুহা. আ. হান্নান সরকার
রানা ভোলা বাজার, তুরাগ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা-১

আমি যেভাবে বিতির নামায পড়ি : প্রথম দুই রাক'আত নামায পড়ার পর তাশাহহুদ পড়ি তারপর দাঁড়িয়ে ফাতেহা পড়ে অন্য সূরা মিলিয়ে আল্লাহু আকবর বলে দু'আয়ে কুনুত পড়ে রুকু-সিজদা করে নামায শেষ করি। কিন্তু এখন আমাকে যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা হলো : দ্বিতীয় রাক'আতে তাশাহহুদ পড়া যাবে না, না পড়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে বাকি নামায ঠিক থাকবে। আসলে মূল বিষয়টি কী? কিভাবে পড়া উত্তম এবং কত রাক'আত পড়া উত্তম?

জিজ্ঞাসা-২

আমার বিবি সাহেবা বিতির নামায এক রাক'আত পড়া শুরু করেছে। নিয়্যাত করে আল্লাহু আকবর বলে হাত বাধে। ফাতেহা পড়ে অন্য সূরা মিলায় তারপর আল্লাহু আকবর বলে মোনাজাতের মতো করে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে দু'আয়ে কুনুত পাঠ করে, তারপর রুকু করে, সিজদা করে এবং আখেরী বৈঠক করে নামায শেষ করে। এই নামায সহীহ হলো কি না?

জিজ্ঞাসা-৩

আমি এবং আমার বিবি সাহেবা বিতির নামায কিভাবে পড়ব? আল্লাহর রাসূল (সা.) কয় রাক'আত এবং কিভাবে পড়েছেন? এসব বিষয়ের সমস্যার সমাধান দিলে উপকৃত হব।

সমাধান :

বিতির নামাযের রাক'আত ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে একাধিক বিরোধপূর্ণ রেওয়ায়েত রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত আছে। তন্মেধ্যে উম্মতে মুসলিমার ইজমার ভিত্তিতে যে রেওয়ায়েতটি সর্বাধিক উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে, তা হলো এক সালামে তিন রাক'আতের রেওয়ায়েত। খোলাফায়ে রাশেদীনসহ বড় বড় ফকীহ সাহাবীগণের আমলও তা-ই ছিল। যার পদ্ধতি হলো, প্রথম রাক'আতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরা মিলাবে তারপর রুকু-সিজদা করবে। এভাবে দ্বিতীয় রাক'আতেও সূরায়ে ফাতেহার পর সূরা মিলাবে। রুক-সিজদার পর প্রথম বৈঠক করবে। তাশাহহুদ পড়ার পর সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাক'আতেও সূরায়ে ফাতেহার পর সূরা মিলাবে। অতঃপর তাকবীর বলে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে। তারপর দু'আয়ে কুনুত পড়বে হাত বাধা অবস্থায়। এরপর রুকু করবে সিজদা করবে এবং দ্বিতীয় বৈঠক শেষে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করবে। অতএব আপনি ও আপনার বিবি সাহেবা বর্ণিত পদ্ধতিতে বিতির নামায আদায় করবেন। (ই'লাউস সুনান ৪/১৭৪০, শরহে মা'আনিল আছার ১/২০৬, বুখারী ১/১৩৬)

প্রসঙ্গ : ইমামত

মুহা. আ. কাদির
মহাখালী টিভি গেট, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

জিজ্ঞাসা :

আমি মহাখালী টিভি গেটস্থ একটি মসজিদের নিয়মিত মুসল্লি, আমি ২০-২৫ বছর যাবত লক্ষ করছি যে ইমাম সাহেব ফরজ নামাযের পূর্বে মুসল্লিদের পেছনে বসে থাকেন। কখনো মেহরাবে এসে পিঠ মুসল্লিদের দিকে দিয়ে বসে থাকেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ইমাম সাহেব অজ্ঞতার কারণে আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করেন এবং অপমানিত করেন।

আমার প্রশ্ন–

১। ইমাম সাহেব কি ঠিক কাজ করে যাচ্ছেন?

২। ইমাম সাহেব কি ইমাম হওয়ার উপযুক্ত?

৩। ইমাম হওয়ার জন্য শরীয়তের বিধান কী? উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর শরীয়তসম্মত সঠিক জবাব দিয়ে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করতে আপনার সদয় মর্জি হয়।

সমাধান :

কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষেধ ও হারাম। বিশেষ করে কোনো আলেম-উলামার দোষ তালাশ করা মারাত্মক গোনাহ। তাই সকলের উচিত আলেম-উলামাদের দোষ তালাশে না পড়ে বরং তাঁদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে তাঁদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলা এবং নিজের ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর ও সুখময় করা। উল্লেখ্য, ইমাম সাহেবের উক্ত কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয়, এর জন্য ইমাম সাহেবকে অবজ্ঞা করার অবকাশ নেই। (সূরা হুজরাত-১২, মা'আরেফুল কুরআন ৮/১২০, মুসলিম ২/৩১৬)

প্রসঙ্গ : তালাক

মুফতী রশীদ আহমদ
পূর্ব নন্দীপাড়া, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

বিগত ২৯/০৬/২০০৯ ইং তারিখে রেজি. কাবিনমূলে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ হয়। অতঃপর বিগত ১৯/১০/২০১৪ ইং তারিখে রেজি. এফিডেভিটমূলে উক্ত স্ত্রী

স্বীয় স্বামীকে তিন তালাক ও বাইন তালাক প্রদানপূর্বক বিবাহ বন্ধন ছিন্ন ঘোষণা করে। উক্ত এফিডেভিটের ২২ হতে ২৬ নং ছতরে স্ত্রী ব্যক্ত করে যে সাক্ষীগণের সম্মুখে আমার স্বামী মুফতী রশীদ আহমদকে কাবিননামার ১৮ নং ধারায় বর্ণিত তালাক তৌফিজের ক্ষমতা অনুযায়ী এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক ও তালাকে বাইন প্রদান করিয়া তাহার সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলাম। আজ হইতে সে আমার স্বামী নয় এবং আমি ও তার স্ত্রী নই। ভবিষ্যতে একে-অন্যকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দাবি করলে তাহা আইনত ও ন্যায়ত অগ্রাহ্য হবে। প্রকাশ থাকে যে, কাবিননামার ১৮ নং ধারায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা প্রদান না করার কথাই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। আরো প্রকাশ থাকে যে, অত্র এফিডেভিটে স্ত্রী তালাকগুলোকে নিজের দিকে সম্বন্ধ না করে স্বামীকে তালাক দেওয়ার কথাই উল্লেখ করেছে।

অত্র এফিডেভিটের ফলে স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ইসলামী শরীয়তের আলোকে ছিন্ন হয়েছে কি না।

সমাধান :

তালাক প্রদানের ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা একমাত্র পুরুষকেই দান করেছেন আর তালাকের পাত্র স্ত্রী, স্বামী নয়। তাই স্ত্রী ইচ্ছে করলেও স্বামীকে তালাক প্রদান করতে পারে না। তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে নিজের নফসের ওপর তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করে থাকে তাহলে স্ত্রী উক্ত ক্ষমতাবলে নিজের ওপর তালাক গ্রহণ করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। যেহেতু সংযুক্ত কাবিননামার ১৮ নং কলাম মতে স্বামী স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করেনি তাই স্ত্রীর পক্ষে তালাকে তফইজ গ্রহণের কোনোরূপ অবকাশ নেই। অতএব স্ত্রী কর্তৃক তৈরীকৃত তালাকনামা কার্যকর হয়নি। (আদ্দুররুল মুখতার ১/২১৫, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ৯/৪২)

প্রসঙ্গ : আত্মসাৎ

আবিদা খানম
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার শাশুড়ি চার সন্তানের জননী। তার ছোট পুত্র আমার স্বামী। আমরা দুজন মিলে আমার শাশুড়িকে কোথাও নিয়ে ওষুধ পান করিয়ে অজ্ঞান করি। তারপর আমার স্বামী টিপ সইয়ের মাধ্যমে আংশিক কিছু সম্পত্তি লিখে নেন এবং বিক্রি করেন। উল্লেখ্য, আমি আমার স্বামীর নির্দেশে তাঁর সাথে এ কাজ করতে বাধ্য হই। আর আমার শাশুড়ি ও এখন বেঁচে নেই। তাই এমতাবস্থায় আমার ও আমার স্বামীর তাওবার জন্য কী করণীয়?

সমাধান :

আপনার ও আপনার স্বামীর জন্য করণীয় হলো, অন্য ওয়ারিশদের সম্পদ বা তৎমূল্য ফিরিয়ে দেওয়া এবং তাওবা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া। (রদ্দুল মুহতার ৪/২৮৩, তফসীরে বায়যাবী ২/৫০৬, কিফায়াতুল মুফতী ১২/৫৭৩)

প্রসঙ্গ : ব্যভিচার

মুফতী নোমান আহমেদ
দক্ষিণখান, আশকোনা, ঢাকা-৯০১১।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকার জনৈক ব্যক্তি অপরের বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে পরকীয়ায় জড়িয়ে পরে এবং তার স্বামীর অজান্তে দৈহিক মেলামেশার ফলে একটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়, ছেলেটির বয়স বর্তমানে ৬-৭ বছর। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমেও ছেলেটি তার বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন সে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। এমতাবস্থায় জানার বিষয় হচ্ছে– ১. বর্তমানে তার করণীয় কী? ওই মহিলার সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ বৈধ হবে কি না? ২. সন্তানের প্রকৃত পিতা শরীয়তের দৃষ্টিতে কে? এবং কার উত্তরসূরি হিসেবে মিরাছ পাবে?

সমাধান :

১. অতীতের অবৈধ সম্পর্কের কারণে যে গোনাহ হয়েছে তার জন্য খাঁটি মনে তাওবা করবে। ওই মহিলার সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ বৈধ হবে না। (সূরা নিসা-৬৩, সূরা নূর-৩০, আদ্দুররুল মুখতার ১/২৪১)

২. শরীয়তের দৃষ্টিতে ওই মহিলার স্বামীই সন্তানের প্রকৃত পিতা বলে গণ্য হবে এবং তারই উত্তরসূরি হিসেবে মিরাছ পাবে। (আবু দাউদ ১/৩১০, রদ্দুল মুখতার ২/৫৫০, ফতাওয়া দারুল উলুম ১১/৫১১)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা. কমর উদ্দীন
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

যদি কোনো মুসল্লি এমন হয় যে শারীরিক অসুস্থতার দরুন স্বাভাবিকভাবে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম, কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম। এমতাবস্থায় তিনি কি সম্পূর্ণ নামায চেয়ারে বসে আদায় করবেন, নাকি ফরজ রুকন হিসেবে দাঁড়িয়ে কিয়াম আদায় করবেন এবং রুকু-সিজদা চেয়ারে বসে আদায় করবেন? মেহেরবাণী করে উত্তর প্রদান করলে বিশেষভাবে উপকৃত হব।

সমাধান :

ফুকাহায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে উক্ত ব্যক্তির জন্য ফরজ, নফল উভয় ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার অনুমতি আছে। তবে সতর্কতামূলক ফরজ নামাযের সূরা-ক্বিরাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। অতঃপর রুকু-সিজদা চেয়ারে বসে আদায় করবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৩৬, আলমুহিতুল বুরহানী ২/২৬০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৩৩৪)